PATHA-SARA

OR

SELECT LESSONS IN BENGALI PROSE AND POETRY.

BY

ANANDA CHANDRA MITRA

AUTHOR OF

Helena Kábya, Mitra Kábya, Prabandhasar, Padyasar, Gadyasar, Shahityasar and Kabyasar &c. &c.

SECOND EDITION.

পাঠসার।

হেলেনা কাব্য, মিত্র কাব্য, সাহিত্যসার, প্রবন্ধসার, কাব্যসার, গদ্যসার ও পদ্যসার প্রভৃতি প্রণেতা

আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY K. C. DATTA B. M. PRESS,
211, CORNWALLIS STREET.

1890.

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী গ্রন্থের অভাব আছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই অভাব স্বয়ং অনুভব করিয়া, এবং কতিপয় কৃতবিদ্য স্বদেশহিতৈষী বন্ধুদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াই, আমি এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে গিয়া, যে সকল বিষয়ে প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখা গিয়াছে, তাহা এই—

(১) বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা,

(২) মহৎ লোকের জীবনচরিত,

(৩) পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে স্থূল স্থূল তত্ত্ব,

(৪) জীব ও জড় জগতে ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল,

(৫) পরিব্রাজকদিগের লিখিত বৈদেশিক আশ্চর্য্য বিবরণ,

(৬) বালক-জীবনের উপযোগী ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা,

(৭) গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা, এবং—

(৮) স্বদেশানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, অধ্যবসায়, বিনয়, ও উপচীকির্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দৃষ্টান্ত।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, পাঠ্যনির্ব্বাচন-বিষয়ে একতা নাই। কোথাও কিছু উচ্চ রকমের পুস্তক, আর কোথাও বা তদপেক্ষা কিছু সহজ পুস্তক, একই শ্রেণীতে পাঠ্য হইয়া থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া, মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর, এবং উচ্চশ্রেণীর স্কুলের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী করিয়া

এই পাঠসার প্রণীত হইল। যদি এই পুস্তক বালক বালিকা-দিগের উপকারে আইসে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়গণ এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া, পাঠসার পাঠ্য নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে কয়েকটী চিত্রদ্বারা, বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ও আনন্দ লাভের অধিকতর সুবিধা করিয়া দিব ইতি।

কলিকাতা, ১২৯৬। গ্রন্থকার।

সূচীপত্র ।

পাঠসার।

রামায়ণ ও রাম-বনবাস।

রামায়ণ আমাদিগের দেশের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহা অপেক্ষা পুরাতন কাব্য নাই, এই জন্যই রামায়ণ প্রণেতাকে কবিগুরু বলিয়া থাকে। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রত্নাকর নামে এক জন দুর্দ্দান্ত দস্যু নরহত্যা করিয়া জীবন যাপন করিত। কালে সেই দস্যু সদ্জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। বহুকাল তপস্যা করিয়া তাহার কাব্যশক্তি লাভ হয়। এক স্থানে অনেক দিন বসিয়া তপস্যা করাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বল্মীক বেষ্টন করিয়াছিল, এইজন্য তাহার নাম বাল্মীকি হইয়াছিল। কবিগুরু বাল্মীকি এখন জগতপূজ্য হইয়া উঠিয়াছেন।

রামায়ণ বৃহৎগ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এখন বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় রামায়ণের অনেক অনুবাদ হইযাছে। কীর্ত্তিবাস নামক একজন প্রাচীন বাঙ্গালি কবি সর্ব্বপ্রথমে রামায়ণ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ অতি মধুর গ্রন্থ। উহা পাঠ করিলে প্রচুর আনন্দ লাভ হয়, এবং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। কথিত আছে, কীর্ত্তিবাস সংস্কৃত ভাষা ও ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, তাঁহার সময়ে গাযকেরা রামায়ণ গাইযা অর্থোপার্জ্জন করিত, সেই সকল গান শুনিয়াই তিনি বাঙ্গালা রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। যথেষ্ট কবিত্ব ও স্মৃতিশক্তি না থাকিলে তিনি কদাপি এরূপ কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। কীর্ত্তিবাস প্রায় চারিশত বৎসর হইল বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাব্য পাঠ করিলে মানুষের প্রচুর উপকার সাধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানানুশীলন করিয়া যেমন মানুষ কল কৌশল নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধন করিয়া থাকে, দর্শন পাঠ করিয়া যেমন লোকের চিন্তা ও বিচারশক্তির বৃদ্ধি হয়, কাব্য পাঠ করিলেও সেই রূপ মানুষের সাধুতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ে সাহসিকতা, প্রেমিকতা ও পবিত্রতা

প্রভৃতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রামায়ণ অতি উৎকৃষ্ট কাব্য; রামায়ণ পাঠ করিলে এই সকল উপকার আমাদিগের প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে।

রামায়ণ পাঠ করিলে আরও যথেষ্ট উপকার লাভ হয়। রামায়ণে এদেশের প্রাচীন কালের অনেক অবস্থার অতি সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। প্রাচীন কালে এদেশীয় রাজাগণ কিরূপে রাজ্য শাসন করিতেন, যোদ্ধাগণ কিরূপে যুদ্ধ করিতেন, আর পণ্ডিতেরা কিরূপে জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, এই সকল কথার বিস্তারিত বর্ণনা রামায়ণে রহিয়াছে। এদেশের লোক কিরূপে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করিত, পিতামাতার সঙ্গে পুত্রকন্যাদিগের কিরূপ ব্যবহার ছিল, গুরুর নিকটে শিষ্যগণ কিরূপে শিক্ষা লাভ করিত, রামায়ণ পাঠ করিলে তাহাও জানিতে পারা যায়।

এদেশের প্রায় তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সময়ে এদেশের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের অবস্থা তেমন ছিল না। এখন আমাদিগের দেশে পৃথিবীর নানা স্থানের লোক বাস করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছে। রামায়ণের সময়ে এদেশের লোক

স্বাধীন ছিল, সুতরাং সমাজের অবস্থা এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে বাহ্য সভ্যতার বৃদ্ধি হইয়া বাষ্পীয় যান নির্ম্মিত হইয়াছে, এখন স্থল ও জল পথে দেশের সর্ব্বত্র গমনাগমন করা যায়; পূর্ব্বে তেমন সুবিধা ছিল না। এখন আমরা সচরাচর যে সকল শকটে আরোহণ করিয়া থাকি, সেই সময়ের শকট বা রথ সেরূপ ছিল না। তখন লোকে রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিত! বর্ত্তমান সময়ে নগর ও রাজপথাদি যেরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সে কালে ঠিক সেরূপ ভাবে প্রস্তুত হইত না। প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ পাঠ করিলে আমরা এই সকল বিষয় জানিয়া প্রচুর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে যে প্রদেশকে অযোধ্যা বলে তাহার অনেক স্থান লইয়া উত্তর কোশল রাজ্য নামে এক পুরাতন রাজ্য ছিল। সূর্য্যবংশীয় নরপতিরা উত্তর কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের রাজত্ব কালে অযোধ্যা নগর কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। তৎকালে অযোধ্যা নগর যথেষ্ট সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। চিরদিন কাহারও সমভাবে যায় না; বর্ত্তমান সময়ে অযোধ্যার ভগ্নাবশেষ সমূহ সরযু নদীর তীরে পড়িয়া রহিয়াছে।

রাজা দশরথ ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে দশরথের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাম সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বুদ্ধিমান, সাহসী ও সুচরিত্র হইয়া প্রজাবর্গের বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ নামক পুণ্যবান ঋষির নিকটে রামচন্দ্র ধর্ম্ম ও রাজনীতির উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে যোগবাশিষ্ঠ কহে। যোগবাশিষ্ঠ অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

বাল্যকালেই রামচন্দ্র বিচক্ষণ বীরপুরুষ ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। মিথিলা নগরের অধিপতি রাজা জনক পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজা জনক এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন যে, একখানি প্রকাণ্ড ধনুকে যে বীরপুরুষ গুণ-যোজনা করিতে পারিবেন, জনকদুহিতা সীতা তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। রামচন্দ্র অসীম বল প্রকাশ করিয়া গুণারোপকরণচ্ছলে সেই প্রকাণ্ড ধনু দ্বিখণ্ড করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাতেই সীতা পরমাদরে রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করেন।

বয়োবৃদ্ধ রাজা দশরথ, রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, অবসর গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন;

ঘটনাক্রমে সেই শুভ কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া, পরে অনেক বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। রামায়ণে সেই সকল বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

যুবরাজ রামচন্দ্র রাজা হইবেন শুনিয়া, প্রজাবর্গ অতি আশ্বস্ত ও রাজপুরবাসীরা যারপরনাই হর্ষযুক্ত হইল। কিন্তু রামচন্দ্রের বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্র রাজা হওয়া দূরে থাকুক, দুঃখীর বেশ ধারণ করিয়া বনবাসী হইলেন। রাজা দশরথ একবার বিস্ফোটকগ্রস্ত হইয়া বড় শঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী কৈকেয়ী বিস্ফোটকের বিষ চোষণ করিয়া পতির প্রাণ রক্ষা করেন। তদ্ধেতু নরপতি মহিষীকে দুইটী বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এতকাল কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করেন নাই। রামের রাজ্যাভিষেক উপস্থিত দেখিয়া প্রতিশ্রুত বর দান প্রার্থনা করিলেন। এক বরে রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের আদেশ, এবং অপর বরে নিজ পুত্র ভরতকে রাজত্ব দান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া, কৈকেয়ী রাজা দশরথের মস্তকে সহসা বজ্রাঘাত করিলেন।

রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না, তাই অনুচিত প্রার্থনা হইতে বিরত হইবার জন্য

কৈকেয়ীকে বহু অনুনয় করিলেন ; কিন্তু কৈকেয়ীর দুর্ম্মতি ফিরিল না। অগত্যা রামচন্দ্রকে জটা ও বল্কল ধারণ করিয়া বনবাসী হইতে হইল। পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য রামচন্দ্র বনগমনে উদ্যত হইলে চারিদিকে হাহাকার উপস্থিত হইল। রাম-জননী কৌশল্যা, বিলাপে আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ; রামানুজ লক্ষ্মণ, রামের বনবাস-সংবাদে প্রথমে মহাক্রোধ প্রকাশ করিলেন, অবশেষে অনুপায় দেখিয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া জ্যেষ্ঠের সঙ্গে বনবাসী হইতে চলিলেন। জনকনন্দিনী সীতা পতির সহগামিনী হইলেন। নগরবাসিরা বহু আক্ষেপ করিতে লাগিল, অনেকে নগর পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমনে উদ্যত হইল।

রামচন্দ্রকে বনবাসী করিয়া শোকে ও দুঃখে রাজা দশরথ অতি সত্বরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিবার সময়ে ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। তিনি অযোধ্যায় আসিয়া পিতৃশোকে ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদে বড় কাতর হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতৃদ্বয় ও ভ্রাতৃবধূর জন্য তিনি যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া, স্বীয় জননী কৈকেয়ীকে অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতাকে বনবাস হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। "আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে না থাকিলে, পিতা ধর্ম্মে পতিত হইবেন," এই কথা বলিয়া অনেক প্রবোধ দিয়া রামচন্দ্র ভরতকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। ভরত অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি এমনই ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন যে, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিতেন না। কথিত আছে রাম চন্দ্রের পরিত্যক্ত পাদুকা সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ভরত ন্যায়পরতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেন।

নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে পঞ্চবটী নামক বনস্থলে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান এবং লঙ্কা-দ্বীপ তখন রাক্ষসরাজ রাবণের অধিকারে ছিল। যাহারা প্রচুর মদমাংস ভক্ষণ করিত, এ দেশের সেই সকল আদিম নিবাসীকে প্রাচীন গ্রন্থকারেরা রাক্ষস বলিতেন। রাক্ষসরাজ রাবণ পঞ্চবটী হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কাতে লইয়া যায়। সীতাশোকে রাম লক্ষ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান পর্য্যটন করেন; অবশেষে সুগ্রীব ও হনুমান প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যবাসী বীর-

পুরুষদিগের সাহায্যে রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া সীতা উদ্ধার করেন।

রামায়ণে দশরথের অপত্যস্নেহ, রামচন্দ্রের ধর্ম্মানুরাগ, ভরত ও লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার সতীত্ব হনুমানের প্রভুভক্তি ও কার্য্যশীলতা প্রভৃতির যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে পাষণ্ডেরও প্রাণ বিগলিত হয়, মানুষ মাত্রেরই নয়নাশ্রু পতিত হইতে থাকে।

জননী।

"মা" কথা মধুর বড় সুধার সমান,
কহিলে শুনিলে সদা জুড়ায় পরাণ ;
যেখানে সেখানে থাকি শত ক্রোশ দূরে,
উদ্দেশে "মা" বলে ডাকি, দুঃখ যায় দূরে।
কিবা সিংহাসনোপরে ভূপতির পতি,
কিবা রণক্ষেত্র মাঝে বীর সেনাপতি,
কিবা দূরদেশগত পরাধীন দাস; *

---

* শিক্ষক মহাশয় দাসত্ব-প্রথার ও দাস-ব্যবসায়ের বিবরণটী বলিয়া দিবেন।

অপার সাগর পারে যাহার নিবাস ;
যে যেখানে মনে করে মায়ের মূরতি,
অমনি অন্তরে তার জন্মে কত প্রীতি !
এমন মায়ের প্রতি ভক্তি নাই যার,
পৃথিবীতে তার মত কে আছে অসার ?

২

মায়ের মমতা কত, কে কহিতে পারে,
কি আছে তুলনা দিতে আর এ সংসারে ?
শত অপরাধে তুমি অপরাধী হও,
প্রসূতীর স্নেহে তবু বঞ্চিত ত নও।
নিতান্ত কুৎসিত কিম্বা নির্গুণ যে জন,
জননীর কাছে সেও অমূল্য রতন।
রোগ হলে কেবা আর জননীর মত,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত ?
গলিত দুর্গন্ধময় সন্তানের দেহ,
জননী রাখেন বুকে, মরি কিবা স্নেহ !
এমন মায়ের সেবা না করে যে জন,
তার মত কোথা আছে পাপীষ্ঠ এমন ?

৩

সন্তান প্রবাসে গেলে স্মরি তার মুখ,
স্নেহ-অশ্রুনীরে ভাসে জননীর বুক ,

যখন শুনেন তার শুভ সমাচার,
উথলে মায়ের প্রাণে আনন্দ অপার।
কখনো শুনেন যদি অমঙ্গল বাণী,
মণিহারা ফণী প্রায় হন পাগলিনী;
জীবন মরণ তাঁর হয় বিবেচনা,
না পেলে সন্তান কাছে না হয় সান্ত্বনা।
অকালে সন্তান যদি যায় পরলোকে,
পাষাণ বিদরে আহা জননীর শোকে!
শোকদগ্ধ মুখে তার চাহে সাধ্য কার?
ধন্য রে মায়ের স্নেহ অপার অপার!!

৪

সুশীল কি গুণবান হইলে সন্তান,
জননীর হয় সদা স্বর্গসুখ জ্ঞান;
লোক মুখে সন্তানের শুনিলে সুখ্যাতি,
শত রাজ্য লাভ জ্ঞান করেন প্রসূতি।
সন্তানের নিন্দাবাদ প্রবেশিলে কানে,
শত শেল বিঁধে যেন জননীর প্রাণে;
এমন সুখের সুখী দুঃখের ভাগিনী,
কে আছে সংসারে আর যেমন জননী?
রাজরাজেশ্বর যদি হয় কোন জন,
রত্ন-সিংহাসনে মায়ে করিয়ে স্থাপন,

নিত্য নিত্য পূজে যদি শত উপচারে
এক বিন্দু স্তন্য-ঋণ শোধিতে কি পারে ?

প্রভাত-বন্দনা।

প্রভাত হইল নিশি, উদিল অরুণ হাসি,
বায়ু বহে তব সমাচার ;
বিহঙ্গ মধুর স্বরে, তব গুণ গান করে,
ঢালি দেয় আনন্দ অপার।
মাতৃ ক্রোড়ে শিশু ছিল, মাতা তারে জাগাইল,
প্রেম বাহু করিয়া বিস্তার,
বিশ্ব-মাতা তব ক্রোড়ে, জাগিল যামিনী ভোরে,
সেইরূপ সকল সংসার।
প্রান্তর কানন মাঝে, অগণ্য কুসুম-সাজে,
হলো যথা শোভা চমৎকার ;
মানবের কোটী আস্য, সেইরূপ করে হাস্য,
অপরূপ রচনা তোমার !
মেলিয়ে যুগল আঁখি, তোমার করুণা দেখি,
খুলে গেল হৃদয়-দুয়ার।
প্রেম-সূর্য্য স্বপ্রকাশ, হৃদয়ের তমোনাশ,
প্রণমি তোমারে বারম্বার।

কুরুক্ষেত্র-মহাসমর।

রামায়ণের মত মহাভারতও অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহাভারতকে কথা অথবা পৌরাণিক ইতিহাস বলা যাইতে পারে। মহাভারত অতি বৃহৎ পুস্তক। উহাতে এত উপাখ্যান, উপদেশ ও বিচিত্র বর্ণনা আছে যে, পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু কুরুপাণ্ডবের বিবরণ এবং কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধই উহার প্রধান বর্ণিত বিষয়। কৌরব ও পাণ্ডবেরা এক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, কিরূপে উত্তরকালে পরস্পরের মহাশত্রু হইয়া উঠে, এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ করিয়া হতবল হয়, এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহাভারত রচনার অনেক পূর্ব্ব হইতেই হস্তিনাপুর নগর চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে তিন পুত্র জন্মেন। তন্মধ্যে ভীষ্ম কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, তাহাতেই জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্য লাভ করিতে

পারিলেন না ; পাণ্ডুই হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পাণ্ডুর সন্তানদিগকে পাণ্ডব কহে। পাণ্ডব-দিগের সঙ্গে বিরোধ হওয়াতেই কেবল ধৃতরাষ্ট্রের সন্তা-নেরা কৌরব নামে অভিহিত হয় ; কৌরব ও পাণ্ডব সকলেই এক কুরুবংশ-সম্ভুত।

পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে রাজনিয়মানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য লাভ করিলেন। পিতৃব্য-পুত্রকে রাজ্য লাভ করিতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন ও তাহার সহোদরেরা অত্যন্ত ঈর্ষাযুক্ত হইয়া উঠিল। তাহা-দিগের ঈর্ষার আরও কারণ ছিল। পাণ্ডবেরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রে কৌরবদিগের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিত ; দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও তাহার সহোদরেরা ইহাতে যারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইত। /

সম্মুখযুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে নিধন করা কঠিন, আর অন্যায়রূপে অনর্থক যুদ্ধ করিতে গেলেও বহুলোক তাহাদিগের পক্ষ হইবে বিবেচনায় কৌরবেরা চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিল। দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনির কুপরামর্শানুসারে দুর্য্যোধন, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অক্ষ-ক্রীড়া আরম্ভ করিল। অপরিণামদর্শী যুধিষ্ঠির ব্যসনে মত্ত হইয়া রাজ্য হারাইলেন এবং অবশেষে পণে পরাজিত হইয়া ভ্রাতৃগণসহ দেশত্যাগী হইলেন।

ইহার পূর্ব্বেও কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য নানা রূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই সকল ষড়যন্ত্রের মধ্যে জতুগৃহ-নির্ম্মাণই সর্ব্বপ্রধান। একবার পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তখন কৌরবগণ তাহাদিগের অনুচর কর্ত্তৃক তথায় লাক্ষাদ্বারা এক রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবদিগকে তন্মধ্যে দগ্ধ করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাণ্ডবদিগের এক জন পিতৃব্য বিদুর অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি এই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পাণ্ডবদিগের রক্ষার্থ একজন খনক প্রেরণ করিলেন। সেই খনকের কৃত সুড়ঙ্গ-পথে রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর নির্ব্বাসিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বীরত্ব ও সাধুতার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতেই অনেকানেক রাজন্যবর্গ ও বীরপুরুষের সঙ্গে তাঁহাদিগের পরিচয় ও আত্মীয়তা হইয়াছিল। ত্রয়োদশ বৎসর পরে পাণ্ডবেরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া স্বরাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, কৌরবগণ রাজ্য ছাড়িয়া দিতে কোন রূপেই স্বীকার করিল না, তাহাতেই কুরুক্ষেত্র-মহাসংগ্রাম ঘটিল।

এই সংগ্রামে আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত রাজাই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সৈন্য এক লক্ষেরও অধিক হইলে উহাকে এক অক্ষৌহিণী বলে। কথিত আছে, কৌরব-পক্ষে এইরূপ একাদশ ও পাণ্ডব-পক্ষে এইরূপ সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের পর কৌরবগণ পরাজিত হইয়াছিল। কৌরবদিগের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথীগণ এবং পাণ্ডব পক্ষে ভীম অর্জ্জুন ও তৎপুত্র অভিমন্যু বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে যদুবংশীয় নরপতি দ্বারকানগরের অধীশ্বর কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পরম সহায় ছিলেন। তাঁহার সহায়তা ও বুদ্ধি-কৌশলেই পাণ্ডবেরা জয় লাভ করিয়া ছিলেন।

মানস উদ্যান।

১। এসো ভাই, চল যাই ফুলের বাগানে,
জুড়াবে শরীর মন সুমধুর ঘ্রাণে।

স্বভাবের শিরোশোভা কুসুম-রতন,
কঠিন-হৃদয় যেবা না করে যতন।
সুজনের মনোহর কুসুমের হার,
মুকুতা প্রবাল মণি বটে কোন্ ছার।
বলিহারি বিধাতার বিচিত্র সৃজন,
মাটি ফাটি পরিপাটি জনমে এমন!
কিন্তু অযতনে ঐ সুন্দর বাগান,
অচিরে হইতে পারে শ্মশান সমান;
আপনি জনমি যত আগাছা অসার,
সহজে উদ্যান-শোভা করে ছারখার।
এইরূপ মানুষের মানস-উদ্যান,
অশিক্ষায় হয় ঘোর অরণ্য সমান,
সদ্ভাব কুসুম আর সুযশ সৌরভ,
না থাকিলে উদ্যানের থাকে না গৌরব,
কুরুচি কুচিন্তা আদি জঙ্গল নিচয়,
মানস-উদ্যান-শোভা সব করে ক্ষয়।
অতএব সুচতুর বাগানির মত
মানস-উদ্যানে যত্ন কর অবিরত।

স্বদেশানুরাগ

জ্ঞানী কি মূর্খ, ধনী কি দরিদ্র, বালক কি বৃদ্ধ, সকলেরই হৃদয়ে জন্ম-ভূমির জন্য স্বাভাবিক অনুরাগ রহিয়াছে। এই অনুরাগ থাকাতেই স্বদেশের সৌভাগ্য সঞ্চার হইতে দেখিলে মানুষের অন্তঃকরণে নিঃস্বার্থ আনন্দ জন্মে; এবং এই স্বাভাবিক অনুরাগ আছে বলিয়াই, পরমুখে স্বদেশের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে মানুষের মনে গুরুতর ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে।

জন্ম-ভূমি মানুষের কি প্রিয় পদার্থ! নির্গুণ বা কুৎসিত হইলেও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মজনকে লোকে যেরূপ ভালবাসে, অসভ্য অথবা প্রাকৃতিক সুখ ও সৌন্দর্য্য বিহীন হইলেও মাতৃ-ভূমিকে মানুষ সেইরূপ ভালবাসে। উত্তপ্ত মরুভূমির পার্শ্বদেশবাসী লোক, কি আগ্নেয়গিরি-সঙ্কুল ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী মনুষ্য, সকলেই স্ব স্ব জন্ম স্থানের একান্ত পক্ষপাতী। আবার মেরু-সন্নিহিত দেশবাসীরা, ফলশস্য-বিহীন ভূমিতে নিদারুণ শীতে পীড়িত হইয়া, এবং বৎসরের অর্দ্ধভাগ সূর্য্যের মুখ দেখিতে না পাইয়াও, স্বদেশকে ভূমণ্ডলের

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থল বিবেচনা করিয়া থাকে। এই জন্য কবি কহিয়াছেন,—"জননী এবং জন্ম ভূমি মানুষের নিকট স্বর্গ হইতেও প্রিয়তর পদার্থ।"

স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবে লোকে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির পতনে আপনাকে পতিত মনে করিয়া ম্রিয়মাণ হয়। যে দেশ জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত, ধন ও বীর্য্যে পরাক্রান্ত, সে দেশের লোকের কি স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ! আর যে দেশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন,দারিদ্র্য বা পরাধীনতায় পীড়িত, সে দেশের লোকের কি শোচনীয় অবস্থা; সে দেশের লোকেরা নিন্দা ও নিগ্রহ ভোগ করিয়াই দিন যাপন করিয়া থাকে।

স্বদেশের সঙ্গে মানব জীবনের সুখ দুঃখের এমন অকাট্য সম্বন্ধ থাকাতেই, মানুষ স্বদেশের ধনবৃদ্ধির জন্য দুস্তর সমুদ্রজলে ভাসমান হয়; এই সম্পর্ক আছে বলিয়াই মানুষ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করে। এই জন্য, যাঁহারা কঠোর সাধনা করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নতি দ্বারা স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, যাঁহারা বিপুল অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া বৈজ্ঞানিক উন্নতি বা ধনবৃদ্ধি দ্বারা স্বদেশকে সুশোভিত করিতে পারেন, অথবা যাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর অস্ত্র উপেক্ষা

করেন, জনসমাজ মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। /

কথিত আছে, গজ্‌নীর অধীশ্বর সুল্‌তান মামুদ লাহোর রাজ্য আক্রমণ করিলে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হিন্দু রমণীগণ আপনাদিগের অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। মধ্যকালে অনেক রজপুত রমণী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, এবং জন্মভূমি পরহস্তে পতিত হইলে চিতারোহণ করিয়া আপনাদিগের কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

পারস্য-রাজ জারক্‌সিস্‌ অগণিত সৈন্য লইয়া গ্রীশ দেশ আক্রমণ করিলে, স্পার্টা-রাজ লিওনিডস্‌ তিন শতমাত্র অনুচর লইয়া থার্ম্মপাইল নামক গিরিবর্ত্মে তাঁহার গতিরোধ করেন। অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে লিওনিডস্‌ ভূতলশায়ী হয়েন। তাঁহার তিন শত অনুচরের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত থাকিয়া স্বদেশবাসীদিগকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করে; গ্রীকগণ সত্বর সমুচিত রণসজ্জা করিয়া শত্রুর চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

মোগল সম্রাট আক্‌বর মেওয়ার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র

ও অপর দুইজন প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। মেওয়ারের অধিপতি মহাবীর প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই অসীম শত্রু সেনার সঙ্গে সংগ্রাম করেন। হল্‌দিঘাট নামক স্থানে মহাযুদ্ধ করিয়া প্রতাপসিংহ পরাজিত হয়েন। এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ পৃথিবীতে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। দ্বাবিংশতি সহস্র রজপুত সৈন্যের মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র বীরপুরুষ হল্‌দিঘাটে সমরশায়ী হন! সেই সকল স্বদেশহিতৈষী বীরপুরুষ বহুকাল হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বীরকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া অদ্যাপি তাঁহাদিগের স্বদেশীয়দিগের উৎসাহ ও স্বদেশানুরাগ জাগ্রত হইতেছে; তাঁহাদিগের জন্মভূমিও পৃথিবীর বীর-জাতিদিগের নিকট চিরকাল সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। কাপুরুষেরাই কুপুত্রের মত জননী জন্মভূমির জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়।

প্রাচীন কালে কোন সময়ে কার্থেজ রাজ্যের সঙ্গে রাজ্য-সীমা লইয়া অপর এক রাজ্যের পুনঃ পুনঃ বিবাদ উপস্থিত হইত। অবশেষে এইরূপ মীমাংসা হইল যে, উভয় রাজ্যের রাজধানী হইতে দুইজন করিয়া দূত এক সময়ে পদব্রজে গমন আরম্ভ করিবেন, এবং উভয়রাজ্যের দূতগণ যে স্থলে পরস্পর মিলিত হইবেন, তাহাই উভয়

রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কার্থেজবাসী দুই সহোদর উল্লিখিত দৌত্য-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। স্বদেশের হিত-সাধন তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য, তাই তাঁহারা প্রাণ-পণ করিয়া এত দ্রুতবেগে গমন করিয়াছিলেন যে, বিরোধীয় ভূমির তিনচতুর্থাংশ পথ অতিক্রম করিলে তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রতিযোগী দূতদিগের সাক্ষাৎ হইল। তখন দুই দলে পুনরায় মহাবিতণ্ডা উপস্থিত হইল, এবং পুনরায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, কোন রাজ্যের দূত-গণ তাঁহাদিগের অভীপ্সিত স্থানে যদি জীবন্ত প্রোথিত হইতে পারেন, তাহা হইলে সেই স্থানই সেই রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে! কার্থেজবাসী দূতদ্বয় তাঁহাদিগের অভীপ্সিত স্থানে আনন্দের সহিত সমাহিত হইয়া স্বদেশের অধিকার বৃদ্ধি ও শান্তি স্থাপন করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদিগের সমাধির উপরে রাজকীয় ব্যয়ে দুই মনোহর কীর্ত্তি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই দুই কীর্ত্তি-মন্দির কার্থেজ রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ও উল্লিখিত বীরপুরুষদিগের দেব-কীর্ত্তির নিদর্শন রূপে বহুকাল বিদ্যা-মান ছিল।

যে দেশের বক্ষে লালিত পালিত হওয়া যায়, যে দেশের অন্নজলে শরীর পুষ্ট হয়, আর যে দেশের

লোকের নিকট কথা কহিতে শিখিয়া মানুষ হওয়া যায়, সে দেশের জন্য যাহার প্রাণে টান নাই; সে ব্যক্তি পশু বা কীটের স্বভাব বিশিষ্ট, ঘৃনার্হ ও হতভাগ্য ! স্বদেশের দুঃখ দুর্দ্দশায় উদাসীন থাকা দূরে থাকুক, প্রকৃত সৎ লোকেরা স্বদেশের অগৌরবের কথা চিন্তা করিতেও কাতর হন।

কোন এক গুরুতর অপবাদে, কসিকা রাজ্যের জনৈক সঙ্গতিশালী লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অপরাধীর ভ্রাতুষ্পুত্র বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইয়া, নিরতিশয় বিনয় ও ব্যগ্রতার সহিত বলিতে লাগিল—"মহাশয় আমি আমার পিতৃব্যের জীবন ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই প্রার্থনা যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমরা রাজকোষে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব, যুদ্ধ কালে পঞ্চাশৎ সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিব , প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহাও বলিতেছি যে, প্রাণ-দান পাইলে আমার পিতৃব্য নির্ব্বাসিতবৎ থাকিবেন, আর দেশে আসিবেন না।" বিচারপতি প্রার্থীকে কহিলেন—"দেখ, আমি জানি, তুমি অবিবেচক ও অপ দার্থ নহ ; তুমি এই ঘটনার সমস্ত অবগত আছ ; তুমি যদি বলিতে পার যে, এইরূপে তোমার পিতৃব্যের দণ্ডাজ্ঞা রহিত করা কসিকা রাজ্যের পক্ষে অগৌরব-

জনক হইবে না, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার পিতৃব্যের জীবন রক্ষা করিব।" বিচারপতির কথা শুনিয়া যুবক বলিয়া উঠিল—"না মহাশয়, আমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য স্বদেশের গৌরব বিক্রয় করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া যুবক অশ্রুপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

নদী।

পর্ব্বতের বক্ষ ভেদি, জনমিলে তুমি নদি,
বিধাতার বিচিত্র কৌশল,
কঠিন কর্ক্কশ যাহা, রসে পরিপূর্ণ তাহা,
পাষাণ ফাটিয়া উঠে জল।
কঠিন বন্ধুর ভূমি, তার অঙ্গে শোভ তুমি,
ঠিক যেন রজতের রেখা,
দূর হতে স্রোতস্বতি, দেখিতে বিচিত্র অতি,
চিত্রপটে যেন চিত্রলেখা।
জন্মিয়া জঙ্গলতলে, হাস্য করি খলখলে,
দূর দেশে করহ গমন;
প্রান্তর নগর কত, বন উপবন শত,
তব তটে শোভে অগণন।

বসিলে তোমার তীরে, শীতল পবন ধীরে,
কত সুখরাশি করে দান ;
তব জলে করি স্নান, তব জল করি পান,
বেঁচে থাকে মানুষের প্রাণ।
ক্ষেত্র মাঝে দাও জল, নানা শস্য ফুল ফল,
উপাদেয় জন্মে কত মত,
তব বক্ষে করি ভর, কাণ্ডারীরা নিরন্তর,
দূর দেশে যায় অবিরত।
কিবা কৃষি কি বাণিজ্য, কিবা সুখ কি সৌন্দর্য্য,
তোমা হতে হয় সমুদয় ;
সদা কর উপকার, নাহি চাহ পুরস্কার,
কত গুণ কহিবার নয় !
ভ্রমিতেছ অবিরাম, নাহি শ্রান্তি কি বিশ্রাম,
কর্ত্তব্যপালনে সদা রত,
রোগ কিম্বা দরিদ্রতা, কিছুই থাকে না তথা
যে দেশেতে তুমি প্রবাহিত।
যাও তবে যাও নদি; তোমায় সৃজিলা বিধি,
জীবের মঙ্গল কামনায় ;
করহ জীবের হিত, যাতে পরমেশ প্রীত,
পূর্ণ কর তাঁর অভিপ্রায়।

আকাশ-মণ্ডল।

আকাশ অনন্ত, কোন দিকেই আকাশের শেষ নাই। রাত্রিকালে আকাশে জ্যোতিঃখণ্ডের মত যে সকল ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাই, উহারা বাস্তব তত ক্ষুদ্র নহে। আমাদিগের বাসস্থল এই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের বেষ্টনের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র ক্রোশেরও অধিক; জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডল এইরূপ চৌদ্দ লক্ষ পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহত্তর। এইরূপ কত লক্ষ লক্ষ সূর্য্য ও কত কোটী কোটী পৃথিবী যে আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে, কে বলিতে পারে? একটী সূর্য্যকে যতগুলি নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করে, তাহাদিগকে গ্রহ কহে, গ্রহদিগকে যাহারা প্রদক্ষিণ করে, তাহাদিগকে চন্দ্র বা উপগ্রহ কহে; আর ঐ সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহদিগের সমষ্টিকে এক সৌরজগৎ কহে। এইরূপ কত সৌরজগৎ যে আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহ জানে না। আমাদিগের এই দৃশ্যমান সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষা কত লক্ষ লক্ষ গুণে বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর সূর্য্যমণ্ডল যে আকাশমণ্ডলকে আলোকিত করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এক মুহূর্ত্তে আলোক শত শত ক্রোশ চলিয়া যায়; নভোমণ্ডলে

এমন দূরবর্ত্তী নক্ষত্র রহিয়াছে যে, অদ্যাপি তাহার আলোক পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে নাই!

আকাশের বহু দূর পর্য্যন্ত বায়ুরাশিতে পরিপূর্ণ। বায়ু তরল পদার্থ, কিন্তু উহা এত সূক্ষ্ম যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন, ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু আছে। আমাদিগের মস্তকের উপরে বহু পরিমাণে বায়ু রহিয়াছে। নিম্নস্থ বায়ুরাশি উপরিস্থ বায়ুরাশিকে প্রতিহত করে বলিয়া আমরা বায়ুর ভার অনুভব করিতে পারি না। এই বায়ুর মধ্যে অম্লজান নামক এক পদার্থ আছে, তাহাতেই জীব-শরীরের শোণিত সতেজ ও পরিষ্কার হয়। তরল ও সূক্ষ্ম বায়ু পতঙ্গগণও শ্বাস-যন্ত্রদ্বারা শরীর মধ্যে গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। যন্ত্র দ্বারা একটী বোতলের বায়ু বাহির করিয়া ফেলিলে, একটী পিপীলিকাও তন্মধ্যে মুহূর্ত্তকাল জীবিত থাকিতে পারে না। এই জন্য সংকীর্ণ স্থানে বহু লোকের সমাগম হইলে শরীর অসুস্থ করে।

বায়ু যেমন তরল ও লঘু, তেমনই স্বচ্ছ। বায়ুরাশি ভেদ করিয়াও আমরা দূরের বস্তু দেখিতে পাই। এই বায়ু যদি স্বচ্ছ না হইত, তাহা হইলে পৃথিবী চিরঅন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। বায়ু তরল না হইলে যেমন

আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া জীবিত থাকিতে পারিতাম না, সেইরূপ আবার বায়ু স্বচ্ছ না হইলে আমরা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতাম। বায়ু স্বচ্ছ না হইলে উহার মধ্য দিয়া আলো যাইতে পারিত না। যদি তেরাত্রি পৃথিবীতে আলোর গতি রোধ হয়, কি ভয়ানক অবস্থা হইয়া উঠে! মানুষের দিক্‌জ্ঞান লোপ পায়, মানুষ এক পদও চলিতে পারে না; মাতার ক্রোড়ে শিশু অপরিচিতের মত থাকে; পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য নামে কিছু থাকিতে পারে না, প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প ও কুৎসিত মৃত্তিকা-খণ্ডে কোনরূপ ইতরবিশেষ থাকে না!

বায়ুর এক অমূল্য গুণ এই যে, উহাতে শব্দ পরিচালিত হয়। একটী বস্তুতে আর একটী বস্তুর আঘাত করিলে সেই বস্তু দুইটী কম্পিত হয়; সেই সঙ্গে আহত বস্তুর বেষ্টনকারী বায়ুরাশিও কাঁপিয়া উঠে। একটী পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে ঢেলা ফেলিলে জলের যেমন তরঙ্গ উঠে এবং একটীর পর আর একটী তরঙ্গ কূলে গিয়া আঘাত করে, আঘাতে বায়ুরও সেইরূপ তরঙ্গ উঠে, এবং সেই তরঙ্গ চারিদিকে বিস্তৃত হয়। ঐরূপ তরঙ্গ আমাদিগের কর্ণের পটহে আঘাত করিলেই আমাদিগের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে। এই জন্য আঘাত করিবার কিঞ্চিৎ পরে আমরা শব্দ শুনিতে পাই। নদীতীরে দূরে যখন রজক

বস্ত্র প্রক্ষালন করে, তখন পাটের উপরে বস্ত্রের আঘাত করিতে দেখিয়াও কিঞ্চিৎকাল পরে আমরা তাহার শব্দ শুনিতে পাই। বায়ুর তরঙ্গই শব্দের কারণ। যে গৃহে বায়ু নাই সে গৃহে আমরা পরস্পরের কথা শুনিতে পাইব না। এই জন্য প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে, তাহার প্রতিকূলদিগের অনুচ্চ শব্দ আমরা শুনিতে পাই না।

সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর স্থল ও জল ভাগ হইতে বাষ্প জন্মে, সেই বাষ্প লঘুতর বলিয়া বায়ুর উপরে ভাসিতে থাকে, ইহারই নাম মেঘ। তরল বায়ুতে ভর করিয়া মেঘ আকাশে সর্ব্বত্র গমনাগমন করে, আর কোন কারণে শীতস্পর্শ হইলেই মেঘের বাষ্প জমিয়া বিন্দু বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হয়; ইহারই নাম বৃষ্টি। যদি অকস্মাৎ অত্যন্ত অধিক শীতল বাতাস লাগে, তাহা হইলে সেই সকল বাষ্পবিন্দু একত্র হইয়া ঘণীভূত হয়, এবং তাহাতেই শীলা-বর্ষণ হইয়া থাকে।

বাষ্পের মধ্যে একরূপ অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকে, উহাকে বিদ্যুৎ বলে। বিদ্যুতগ্নির গতি অতি দ্রুত। আকাশ-মণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন হইলে ঘন ঘন বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে। মেঘখণ্ড সকল পরস্পর সম্মিলিত বা নিকটবর্ত্তী হইলেই তন্মধ্যস্থ অগ্নিরাশি পরস্পরের আকর্ষণ ও সংঘর্ষণে

ভয়ানক বেগে সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালনের নাম বিদ্যুৎখেলা। আর এইরূপ সঞ্চালনে বায়ুর মধ্যে যে ভয়ানক আঘাত লাগে, তাহাতেই বজ্রধ্বনি হয়। বিদ্যুতগ্নি অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া লতিকার মত সরু দেখায়, বাস্তব উহা তত সরু নহে। সময়ে সময়ে ঐ অগ্নিস্রোত অতি প্রশস্ত হইয়া থাকে। আকাশে যেরূপ বিদ্যুৎ আছে, পৃথিবীতেও সেইরূপ বিদ্যুৎ আছে। যখন মেঘ পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কোন কারণে পৃথিবীস্থ বিদ্যুতের আকর্ষণে মেঘস্থ বিদ্যুতগ্নি স্খলিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠে প্রবেশ করে। যাহার উপরে পড়ে, তাহা যদি জল বা লৌহ প্রভৃতির মত পরিচালক না হয়, তাহা হইলেই বিদ্যুতের বেগ-গতিতে উহা ভাঙ্গিয়া বা চূর্ণ হইয়া যায়। বিদ্যুৎপাতে অনেক সময়ে অনেক সুরম্য অট্টালিকা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতি নিকটে বা উপরে বিদ্যুৎপাত হইলে তাহার আকর্ষণে মানবদেহের উষ্ণতা হরণ করে. তাহাতেই মৃত্যু হইয়া থাকে। অজ্ঞ লোকেরা বজ্রপাতের কারণ না জানিয়া উহাকে ইন্দ্রের অস্ত্রপাত বলিয়া বিশ্বাস করে।

/ ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল;—পৃথিবীর জল উত্তাপে বাষ্প হইয়া বায়ুভরে ভাসিতে থাকে, আবার শীতল বায়ুর স্পর্শে তাহাই বৃষ্টিবিন্দু রূপে ভূতলে পতিত

হইয়া ফল শস্য উৎপাদন করে। এই বাষ্পে আকাশের কি আশ্চর্য্য শোভাই সম্পাদন করে! বাষ্পরূপী মেঘ সকল নানা বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশে বিচরণ করে; অনেক সময়ে যেন বহুরূপীর মত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অবয়ব পরিবর্ত্তিত করিয়া মানুষের নয়ন ও মনকে মোহিত করিতে থাকে। এই বাষ্পের উপরে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হইয়া অতি বিচিত্র রামধনুর সৃষ্টি হয়, রামধনু এত মনোহর যে, পলকের মধ্যে বিলুপ্ত হয় বলিয়া মনে দারুণ ক্ষোভ জন্মে।

ব্যোমযান নামক একরূপ আকাশগামী যান আছে; অদ্যাপি উহার সমুচিত উন্নতি হয় নাই। কালে উহার উন্নতি হইলে মানুষ স্বচ্ছন্দে আকাশপথে বিচরণ করিতে পারিবে। ইহার মধ্যেই অনেকে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশের বহু দূরে উঠিয়াছেন, এবং পর্য্যটন করিয়াছেন। তাঁহারা তথা হইতে ভূমণ্ডলের যেরূপ আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে অন্তঃকরণ পুলকে পূর্ণিত হয়। যে আকাশ নীল চন্দ্রাতপের মত আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, যে আকাশের অঙ্গে নক্ষত্র সকল মণি-শ্রেণীর মত ঝলমল করিতেছে, যে আকাশে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণমালা বিস্তীর্ণ হইয়া

উহাকে কণকরঞ্জিতবৎ করিতেছে, যে আকাশে সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামধনু উদিত হইয়া কুণ্ডলের মত শোভা পাইতেছে, আর যে আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র বিরাজ করিয়া সমস্ত জগৎকে হাস্যপূর্ণ করিতেছে, সে আকাশে মানুষ যদি স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, তবে সত্য সত্যই মানুষের জীবন ও নয়নের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। /

সন্ধ্যাবর্ণন।

দিন গেল সন্ধ্যা হলো ফুরাইল বেলা,
আইল যামিনী পরি প্রদীপ-মেখলা ;
কুঞ্চিত কমলকুল হলো একে একে ;
ভ্রমরেরা গেল ঘরে গুণ্ গুণ্ ডেকে ;
রাখাল চলিল ঘরে বাজাইয়া বেণু
মধুর সস্নেহ ভাষে খেদাইয়া ধেনু ;
উঠিল স্তুতির ধ্বনি ভজন-মন্দিরে,
ভকত কীর্ত্তন করে মৃদুল গম্ভীরে ;
বালক বালিকা যত আকাশে চাহিয়া,
নাচিতে লাগিল সবে করতালি দিয়া ;
আকাশে উঠিল তারা কত শত শত,

নীল চন্দ্রাতপে দীপ্ত হীরকের মত ;
পড়িয়াছে জ্যোৎস্না-রাশি তটিনীর নীরে,
তরঙ্গে চাঁদের ছায়া নাচে ধীরে ধীরে ;
চলেছে ভাঁটার জলে অনেক তরণী,
তুলিয়াছে বাহকেরা সঙ্গীতের ধ্বনি ;
অনেক প্রদীপ জ্বলে তটিনীর গায়,
নক্ষত্র খসিয়া যেন পড়েছে ধরায় !
যুটিয়াছে জলচর যতেক বিহঙ্গ,
শীতল সলিলে পশি করিতেছে রঙ্গ ;
ধরণী ধরিল কিবা প্রশান্ত মূরতি,
দেখে ভাবুকের প্রাণ হরষিত অতি।
এমন সুন্দর সন্ধ্যা যাঁহার রচন,
অনন্ত তাঁহার গুণ, না যায় বর্ণন !

সংসার-রঙ্গভূমি।

এ সংসার রঙ্গভুমি, ভাবুক পথিক তুমি,
দেখহ ভাবিয়া এক বার ;
আজ মহারাজা যেই, কাল্ তার কিছু নেই,
অকস্মাৎ ভিক্ষা-পাত্র সার।

এই দিবা এই রাত্তি, এই ধ্বংস এই স্থিতি,
এই আলো এই অন্ধকার ;
এখনি উৎসব রঙ্গ, সহসা সে সুখ-ভঙ্গ,
এই হাস্য এই হাহাকার।
এই শিশু এই যুবা, অপরূপ দৃশ্য কিবা,
ভাবিতে বিস্ময়ে ডোবে মন ;
এই বৃদ্ধ লোলদেহ, এই আর নাই সেহ,
হলে মৃত্যু পটের ক্ষেপণ ;
বিধাতার অভিনয়, কিছুইতো স্থায়ী নয়,
কেবল সুকৃত সঙ্গে যায় ;
সাবধান হ'য়ে তাই, চলো রে পথিক ভাই,
ভুলিওনা পাপের মায়ায়।

——:*:——

মানুষের মহত্ত্ব।

যাহাদিগের প্রচুর বিদ্যাবুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য বা পদমর্য্যাদা আছে, লোকে সচরাচর তাহাদিগকেই বড় লোক বলিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল থাকিলেই লোক মহৎ হয় না ; প্রকৃত মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য্য বা পদমর্য্যাদা প্রভৃতির মুখাপেক্ষা করে না। যাঁহারা সাহস, অধ্যবসায়,

ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরোপকার বা কর্ত্তব্যপালন দ্বারা সংসারের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন তাঁহারাই প্রকৃত মহৎ, তাঁহারাই বড় লোক ৮

যদি বিদ্যা বুদ্ধি বা ধন থাকিলেই লোক বড় লোক হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নানা বিদ্যাবিশারদ, অথচ অলস ও অপদার্থ তাহাকে, এবং যে ব্যক্তি প্রখর বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন, কিন্তু সেই বুদ্ধি সৎ বিষয়ে প্রয়োগ না করিয়া অসাধু পথে প্রয়োগ করে, তাহাকেও বড় লোক বলিতে হয়। এরূপ হইলে যে ব্যক্তি স্বয়ং ঘোর মূর্খ হইয়াও পৈত্রিক বিপুল বিত্ত উত্তরাধিকার করিয়াছে, অথবা কৃপণতা দ্বারা বা পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ধনশালী হইয়াছে, তাহাকেও বড় লোক বলিতে হয়। উচ্চবংশে অনেকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, অনুপযুক্ত হইয়াও অবস্থা বা স্বজনের আনুকুল্যে অনেকেই উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারে, তাই বলিয়া সে বড়লোক হয় না। বিদ্যা বুদ্ধি সঙ্গতি বা উচ্চপদ লোকের কার্য্য করিবার সহায় ও সুযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহাতে মানুষের মহত্ত্বের কিছুই পরিচয় হয় না; মানুষের চরিত্রের পরীক্ষাই মহত্ত্বের যথার্থ পরীক্ষা।

কথিত আছে, মহারাষ্ট্র-মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবজী

বর্ণজ্ঞানহীন ছিলেন। সাহস ও অধ্যবসায়ে তাঁহার তুল্য বীর পুরুষ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতি উচ্চবংশে বা ঐশ্বর্য্যশালী গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথচ সাহস ও অধ্যাবসায়ের গুণে মহাপরাক্রমশালী মোগল সম্রাটের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কেবল ভাষা শিক্ষা করিলে, অথবা কেবল নানা বিদ্যা বা শাস্ত্রের আলোচনা করিলেও মানুষ বড় লোক হয় না। শিবজী গ্রন্থকীট অথবা বহু বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন না বটে, কিন্তু স্বকীয় বীরত্ববলে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে। আর যতকাল পৃথিবীতে সাহস ও অধ্যবসায়ের আদর থাকিবে, ইতিহাস তাঁহার যশোবর্ণন করিতে থাকিবে। শিবজী স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন না, কিন্তু বিদ্যার পরম সমাদর করিতেন। কত লোক বিপুল বিদ্যা উদরসাৎ করিয়াও বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিতে জানে না,আহার বিহার ও ইতর আমোদেই জীবন ক্ষয় করিয়া থাকে।

কর্ত্তব্যজ্ঞান মানব মনের অতি সুন্দর ভূষণ ; কর্ত্তব্য পালনেই মানুষের মহত্ত্বের যথার্থ পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাঁহারা কর্ত্তব্য পালনের জন্য পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়

করিতে এবং গ্লানি বা ভর্ৎসনা শ্রবণ করিতে ভীত না হন, তাঁহারাই যথার্থ মহৎ। আর যাহারা কর্ত্তব্য-পালনে শৈথিল্য করে, কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া লোকের ভ্রূকুটিতে ভয় পায়, কিম্বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহারা সত্য সত্যই কাপুরুষ ; বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনবান বা উচ্চপদস্থ হইলেও তাহারা ঘৃণার পাত্র—বড় লোক নহে।

রুষিয়ার সম্রাট মহাপুরুষ পিটার কর্ত্তব্য-পালনের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। রাজ্যের সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য তিনি অনেক সময়ে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়া প্রজাবর্গের অভাব দূর করিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প ছিল। এই সংকল্প সাধন করিতে যাইয়া অনেক সময়ে তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। এই জন্য তিনি কখনও পদব্রজে বহু পর্য্যটন করিয়াছেন, কখনও বা অনাহারে দিন যাপন করিয়াছেন, রাজাধিরাজ হইয়াও এই জন্য তিনি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে তৃণশয্যায় নিশি যাপন করিয়াছেন।

পিটারের পূর্ব্বে রুষরাজ্যের অবস্থা অতি হীন ছিল। তিনি প্রজাদিগের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। রুষীয়দিগকে পৃথিবীর নিকট গণ্যমাণ্য জাতি করাই

তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, এই জন্য তিনি রুষীয়দিগকে নৌ-বিদ্যা শিখাইতে সংকল্প করিলেন। স্বয়ং পোত-নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়া প্রজাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, তিনি হলণ্ড দেশের রাজধানী আম্ষ্টারডাম্ নগরের অনতিদূরবর্ত্তী রটারডাম্ নগরে সূত্রধরের বেশে অবস্থিতি করিয়া পোতনির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অতি সামান্যরূপ আহার ও পরিচ্ছদ সহকারে অপর সূত্রধরদিগের সঙ্গে থাকিতেন, এবং অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। সকলে তাঁহাকে 'মাষ্টার পিটার' বলিয়া ডাকিত। তিনি সকলের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে সময় যাপন করিতেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বকীয় ঐশ্বর্য্য বা পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন না। কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহাকে অতুল স্ফূর্ত্তি প্রদান করিত। যাহারা আপণে যাইয়া স্বহস্তে সামান্য গৃহসামগ্রী আনয়ন করিতে, অথবা পথপ্রান্তে পতিত অন্ধ বা খঞ্জের হস্ত ধারণ করিতে লজ্জা বোধ করে, তাহারা নিতান্ত অবিবেচক ও অপদার্থ।

রুষিয়ার প্রাচীন রাজধানী মস্কো নগরের অনতি-দূরে ইস্তিয়া নামক স্থানে পিটার একমাস কাল অবস্থিতি করেন। সেই স্থানে মূলার নামে একজন কর্ম্মকার

কার্য্য করিত। নিয়মিত রূপে রাজকার্য্য সমাধা করিয়া সম্রাট তাহার দোকানে যাইয়া কর্ম্মকারের কার্য্য শিক্ষা করিতেন। পিটারের স্বহস্ত-নির্ম্মিত ও স্বনামাঙ্কিত একখানি লৌহদণ্ড সেণ্টপিটার্স্‌বর্গের চিত্রশালায় অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বকীয় অথবা পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা হলচালন বা নৌ-দণ্ড ধারণ উচিত মনে করেন, অথবা যাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির হিতের জন্য রাজপুত্র হইয়াও কর্ম্মকার বা সূত্রধরের কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাঁহারাই যথার্থ মহাত্মা। স্বদেশীয়দিগকে সমুচিত শিক্ষা দান করিবার জন্য আর তাহাদিগকে শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্যই পিটার্ এইরূপ প্রাণপণে যত্ন করিতেন। একদিকে তিনি এই সকল কার্য্য করিতেন, অপরদিকে তিনি রাজনীতিজ্ঞদিগের শিরোভূষণ ছিলেন; তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানবত্তা এবং হৃদয়ের এই অলৌকিক মহত্ত্ব চিরকাল তাঁহার নাম জাগরূক রাখিবে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে জন ওয়েস্‌লি নামক একজন মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ওয়েস্‌লির ধন সম্পদ কিছুই ছিল না, বিদ্যাবুদ্ধিতেও তিনি অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন না; কিন্তু জ্বলন্ত বিশ্বাস

ও ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে তিনি জনসমাজের পূজনীয় হইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বস্থলে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়! এই মহাত্মা যখন যেখানে যাইতেন, যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়া লোকদিগকে বশীভূত করিতেন। একবার কতকগুলি লোক ওয়েস্‌লির নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করে। অভিযোগকারীগণ সকলেই বিরক্ত ও উত্তেজিত। কিন্তু বিচারপতি যখন সে সকল লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওয়েস্‌লির বিরুদ্ধে তোমাদিগের কাহার কি অভিযোগ আছে, নির্দ্দেশ করিয়া বল," তখন কেহই কিছু বলিতে পারিল না; কেবল একজন লোক এই মাত্র বলিল,—"ওয়েস্‌লি আমার গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে; আমার পত্নী পূর্ব্বে অনেক কথা কহিত, ওয়েস্‌লির মতানুবর্ত্তিনী হইয়া অবধি প্রায় কথা কহে না। বিচারপতি বলিলেন, "যদি ওয়েস্‌লির এইমাত্র অপরাধ হয়, তবে পল্লীতে যত মুখরা স্ত্রীলোক আছে, সকলকেই ওয়েস্‌লির কাছে পাঠাইয়া দাও।" ধর্ম্মানুপ্রাণিত ওয়েস্‌লির উপদেশ ও দৃষ্টান্তগুণে সহস্র সহস্র আত্মা পাপ ও কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথের পথিক হইয়াছিল।

ওয়েস্‌লি একবার পথিমধ্যে একাকী দস্যুহস্তে

পতিত হন। দস্যু তাঁহার সমস্ত সম্বল অপহরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, ধর্ম্মবীর ওয়েস্‌লি তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি জীবিকা-নির্ব্বাহের যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তজ্জন্য একদিন তোমাকে ঘোরতর অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে, আর ইহাও মনে রাখিও যে, ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই মানুষ পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারে।" এই ঘটনার বহু বৎসর পরে ওয়েস্‌লি একদিন উপাসনা শেষ করিয়া ভজনালয় হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে একজন মনুষ্য সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিল—"মহাশয়, বহুকাল হইল একবার অমুক স্থলে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন, মনে পড়ে কি? আমিই সেই হতভাগ্য দস্যু। আপনি সে সময়ে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতেই ক্রমে আমার অন্তর পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, আমি ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছি।"

ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মোৎসাহের বলে এই মহাত্মা অসম্ভব পরিশ্রম করিতে পারিতেন। পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক কাল তিনি ধর্ম্ম প্রচার করেন। এইকাল মধ্যে তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ সহস্র বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান ও প্রায় এক লক্ষ বার হাজার ক্রোশ পথ পর্য্যটন

করেন। তাঁহার চিন্তা ও পরিশ্রমের কথা শুনিলে যেমন বিস্মিত হইতে হয়, তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা ও দান-শৌণ্ডের বৃত্তান্ত শুনিলেও সেইরূপ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। পার্লিয়ামেণ্টের বিধি অনুসারে একবার তাঁহার নিকটে এইরূপ এক অনুজ্ঞাপত্র আসিয়াছিল—'আপনার গৃহে ব্যবহার্য্য যে সকল রৌপ্যপাত্র আছে, অগৌণে তাহা রেজেষ্টরি করিবেন এবং বিধি প্রচারিত হওয়ার দিন হইতে তজ্জন্য নির্দ্ধারিত মাশুল প্রদান করিবেন।" ওয়েস্‌লি সেই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন—"লণ্ডন নগরে দুই খানি ও ব্রিষ্টল নগরে আর দুই খানি রূপার চামচ্ ভিন্ন আর কোন রৌপ্যপাত্র আমার নাই : আমার চতুর্দ্দিকে অনাহারে কত কত লোকের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, আমার আর রূপার পাত্র খরিদ করিবার সাধ নাই!"

এই মহাপুরুষ প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিলে প্রথম বর্ষে তিনশত মুদ্রা বেতন পান। তন্মধ্যে দুইশত আশী মুদ্রা নিজে ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট বিংশতি মুদ্রা পরোপকারে দান করেন। ক্রমে তাঁহার বেতন যখন ছয়শত, নয়শত এবং বারশত মুদ্রা হইয়াছিল, তখনও তিনি উল্লিখিত দুইশত অশীতির অধিক একটী মুদ্রাও নিজের জন্য ব্যয় করিতেন না। সমস্ত জীবনকালে তিনি তিন

লক্ষেরও অধিক মুদ্রা পরোপকারে দান করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিরাই দেশকাল-নির্ব্বিশেষে প্রকৃত মহৎ বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

য়াবতী।

কুসুমকুমারী নামে ; বণিকের বালা,
বড় ভালবাসি তারে প্রতিবেশী মাঝে,
সরলা সুশীলা মেয়ে কুসুম-কোমলা,
ভাল কাজ করেও সে মরে যায় লাজে।

২

কটু মুখ কটু কথা জানে না কেমন,
সকল সময়ে করে মধুর ব্যভার।
ঠিক যেন সেফালিকা নয়ন-রঞ্জন,
মাটিতে পড়েও করে সুগন্ধ বিস্তার।

৩

আলস্য কি কপটতা কিছু সে জানে না,
নাহি জানে হিংসা দ্বেষ কিবা অহঙ্কার,

কেহ ডাকে "দিদিমণি" কেহ ডাকে "মা,"
সার্থক 'কুসুম' নাম হয়েছে তাহার।

৪

চারিদিকে আছে যত দরিদ্র ভিখারী,
সকলে রেখেছে তার "দয়াবতী" নাম,
তাহার দয়ার কথা যাই বলিহারি,
পরদুঃখে অশ্রু তার ঝরে অবিরাম।

৫

এক দিন দেখিলাম বণিকের মেয়ে,
আলুথালু কেশ বেশ মলিন বদন,
পাগলিনী প্রায় যেন চলিয়াছে ধেয়ে,
অমনি পশ্চাতে তার করিনু গমন।

৬

প্রতিবেশী কোন এক দরিদ্রের ছেলে
(তিন বছরের শিশু পুতুলের প্রায়)
কি হলো কোথায় গেল, কেহ নাহি বলে,
সবে করে ছুটাছুটি হেথায় সেথায়।

৭

অদূরে পুকুর এক করি দরশন,
কুসুমকুমারী তাতে পড়িল ঝাঁপিয়া ;

বহু ক্লেশে করি তথা বহু অন্বেষণ,
উঠিল সে মৃতপ্রায় বালকে লইয়া।

যতক্ষণ বালক আছিল অচেতন,
কুসুম দাঁড়ায়ে ছিল পুত্তলিকা প্রায়,
অনিমেষে শিশুমুখে রাখিয়া নয়ন,
প্রখর ভানুর কর লইয়া মাথায়।

৯

বহু শুশ্রূষায় শিশু মেলিলে নয়ন,
কুসুমের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল ;
লোকের প্রশংসা বাদ না করি শ্রবণ,
ধীরে ধীরে দয়াবতী গৃহেতে চলিল।

১০

মানুষের প্রতি দয়া শুধু নহে তার,
বড় দয়াবতী সেই কুসুম-কুমারী
সকল জীবেই করে সদয় ব্যভার,
তাহার গুণের কথা যাই বলিহারি।

১১

এক দিন মাঘ মাসে সন্ধ্যার সময়,
পথি মধ্যে দেখেছিল কুসুমকুমারী,

কুক্কুর-শাবক এক ভগ্ন-পদদ্বয়,
অর্দ্ধমৃত প্রায় শীতে কাঁপে থরহরি।

১২

তখনি আনিল তারে আপনার গৃহে
দয়াবতী, দয়া যার অতি নিরমল,
স্বহস্তে ঔষধ পথ্য দিয়া অতি স্নেহে ;
অচিরে করিল তারে সুন্দর সবল।

১৩

আদর করিয়া তার নাম দিল "ফেণী,"
শিখাইল নানা কার্য্য যতন করিয়া ;
মাঠে ঘাটে বিদ্যালয়ে করিল সঙ্গিনী,
অন্ধকারে যায় ফেণী আলোটী ধরিয়া।

১৪

এক দিন দূর পথে করিতে ভ্রমণ;
পথ হারাইয়া ফেণী হেথা সেথা যায় ;
ক্রমে হলো অন্ধকার সন্ধ্যা আগমন,
কুসুমে না হেরি ফেণী পাগলিনী প্রায় !

১৫

এ পাশে ও পাশে ছুটে যেন জ্ঞানহারা,
শকটের তলে ফেণী সহসা পড়িল !

শুনে কুসুমের চক্ষে বহে জলধারা,
অমনি ফেণীরে আসি অঙ্কেতে লইল।

১৬

কুসুমের কোলে ফেণী তখনি মরিল,
দেখিলাম বার বার মুখ পানে চায়,
নিঃশব্দ ভাষাতে যেন একথা কহিল,
"দয়াবতি, বাঁধা আমি তোমার দয়ায়।"

১৭

উদ্যানের প্রান্তে করি ফেণীরে প্রোথিত,
করেছে তাহার পরে ইটের গাথুনি,
এই কথা তার অঙ্গে রয়েছে লিখিত,
"দয়াতে হইয়া বশ প্রাণ দিল ফেণী।"

হিমান্ত প্রদেশ।

পর্য্যটকেরা পৃথিবীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কত কত আশ্চর্য্য পদার্থ ও অদ্ভুত কাণ্ডই প্রত্যক্ষ করেন। যাহারা নিজ গৃহ, নিজ পল্লী বা নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কাতর হয়, তাহারা সৃষ্টির শোভা সন্দর্শন করিয়া

নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে না। নানা দেশ, নানা স্থান বা নানা প্রকারের দৃশ্য দেখিলে যে কেবল নয়ন ও মন পুলকিত হয় তাহা নহে, উহাতে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইয়া জ্ঞানোন্নতি হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, এবং কুসংস্কার ও অনুদারতা চলিয়া যায়। পর্য্যটকেরা আপনাদিগের তৃপ্তি ও উন্নতি এবং জগতের হিতের জন্য নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। আপনারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হয়েন, জনসমাজের হিতের জন্য তাঁহারা তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। সেই সকল বিবরণ অধ্যয়ন করিলেও প্রচুর অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লাভ করা যায়।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তকে মেরু কহে। উত্তর প্রান্তের নাম সুমেরু ও দক্ষিণ প্রান্তের নাম কুমেরু। এই মেরুদেশ চির তুষারাবৃত। মেরুদেশের কেন্দ্র-স্থান অদ্যাপি কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। অনেক সাহসী লোক ঐ কেন্দ্র-স্থান আবিষ্কার করিতে যাইয়া দারুণ শীতে গতাসু হইয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে অনেক সাহসী নাবিক বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান লইয়া মেরু-সাগরে যাইয়া অনুচরবর্গ সহ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এই মেরুস্থানে বৃক্ষলতাদি কিছুই নাই, মনুষ্যের বসতি নাই। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়

ঐ দেশে সূর্য্যরশ্মি পড়ে না। স্থলভাগ বরফে আবৃত, সমুদ্রের জলেও দ্বীপের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-শৈল ভাসিয়া বেড়ায়। সেই সকল তুষার-শৈলের দারুণ ঘর্ষণেও অনেক অর্ণবপোত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুরন্ত শীতে অবশ হইয়া, অগ্নি জ্বালিবার চেষ্টায় অকৃত-কার্য্য হইয়া অনেক নাবিক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এই মেরু স্থানের নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থলে অল্প অল্প বৃক্ষলতা ও মনুষ্যের বিরল বসতি আছে, তাহাকেই হিমান্ত প্রদেশ কহে। আমেরিকার উত্তরে গ্রীনলণ্ড, ও রুষিয়ার উত্তরে ল্যাপলণ্ড দেশ এই হিমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত। আমরা এই প্রস্তাবে উত্তর হিমান্ত প্রদেশেরই বৃত্তান্ত বর্ণন করিব।

হিমান্ত প্রদেশবাসীরা শীতকালে সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না। ইহার দুই কারণ,—পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ গোলাকার বলিয়া যতই উত্তর দিকে যাওয়া যায়, সূর্য্যকে ততই দক্ষিণ দিকে হেলান দেখিতে পাওয়া যায়, আবার শীত ঋতুতে সূর্য্য দক্ষিণায়ণে গমন করে বলিয়া, হিমান্ত প্রদেশে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সূর্য্য অদৃশ্য হয় বলিয়া ঐ সকল লোক বৎসরের অর্দ্ধভাগ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বা দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত থাকে না। ঐ সময়ে দিবাভাগে আরোরাবরিয়ালিস্ নামক এক রূপ আলোক জন্মে।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে যত পরিষ্কার দেখা যায়, উহাতে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহাতে দৈনিক কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

হিমান্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা অধিক নহে। সে দেশে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতার উন্নতি হয় নাই। বিদ্যা-চর্চ্চা ও সভ্যতা বিস্তার হইলে কালক্রমে ঐ সকল লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। এইক্ষণ উহারা অতি হীন অবস্থাতেই দিন যাপন করিতেছে। পশুপালন, মৃগয়া ও মৎস্য ধরাই এইক্ষণ উহাদিগের প্রধান কার্য্য। লোকগুলি প্রায় খর্ব্বাকার এবং পানভোজনে মত্ত। লাপ্‌লণ্ডের ও ফিন্‌লণ্ডের অধিবাসীদিগকে লাপ ও ফিন্‌, এবং গ্রীনলণ্ডের অধিবাসীদিগকে এস্কুইমা বলে। এস্কুইমাগণ এমন উদর-পরায়ণ যে, উৎসবাদিতে ভোজ হইলে অনেক পুরুষ অপর্য্যাপ্ত আহার করে, আহার করিতে করিতে অসমর্থ হইয়া সংজ্ঞা হীনের মত শয্যাতে পড়িয়া থাকে, গৃহিণীরা শায়িত রাক্ষসদিগের মুখে আরও এক এক খানি করিয়া মাংসখণ্ড স্থাপন করিয়া তবে আপনারা আহারে প্রবৃত্ত হন!!

হিমান্ত প্রদেশে বৃক্ষলতা, ইষ্টক ও চূর্ণক দুষ্প্রাপ্য; এজন্য সে দেশে আমাদিগের দেশের মত সুন্দর গৃহ

বা অট্টালিকা নাই। তদ্দেশবাসীরা গ্রীষ্মকালে শিবির মধ্যে বসতি করে; আর শীত ঋতুতে তুষার দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। আরব ও আফ্রিকার মরুভূমিতে বেদিয়া জাতির যেরূপ স্থির আবাস নাই, ইহাদিগেরও প্রায় তদ্রূপ। আবাস-যোগ্য স্থলে অনেক লোক ঘন ঘন শিবির সন্নিবেশ করিয়া, হিমান্ত প্রদেশবাসীরা যেন স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হট্ট সংগঠন করে। এই সকল চলন্ত গৃহেই হিমান্ত প্রদেশবাসীরা আদান প্রদান ও বিনিময়াদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া বসতি করিয়া থাকে।

তুষার দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিবার কথা শুনিয়া হয়ত অল্পবয়স্ক পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবে। যে তুষারের ক্ষুদ্র এক খণ্ড হস্তে লইলে হস্ত অবশ হইয়া পড়ে, তদ্দারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতেই বসতি করা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও উহা অসম্ভব নহে। জল জমিয়া বরফ হয়; জলের মধ্যে তাপের অংশ বেশী, এজন্য তুষার-নির্ম্মিত গৃহের মধ্যভাগ বেশ উষ্ণ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে তুষার গলিয়া গৃহ নষ্ট হইবারও আশঙ্কা নাই; কেননা সে দেশে শীত ঋতুতে তুষারখণ্ড সকল ইষ্টকের মত শক্ত থাকে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তুষার খণ্ড সকল যোজনা

করিয়াই হিমান্ত প্রদেশ-বাসীরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

হিমান্ত প্রদেশে তরল জল শীত ঋতুতে কুত্রাপি থাকেনা। প্রবল শীতে সে দেশের সমস্ত জল প্রস্তরবৎ হইয়া থাকে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও সে দেশে নদী হ্রদ বা তড়াগাদিতে এক বিন্দু জল পাইবার প্রত্যাশা নাই! সে দেশবাসীদিগকে যেন 'সমুদ্রে থাকিয়া পিপাসায় মরিতে' হয়। জলের গৃহে বাস করিয়াও তাহারা জলকষ্ট ভোগ করে। অগ্নি জ্বালিয়া তুষার-খণ্ড না গলাইলে আর পানীয় জল পাওয়া যায় না; এজন্য সে দেশে প্রতি পরিবারে গৃহকোণে বসিয়া দীপশিখাতে তুষারখণ্ড গলাইয়া এক জন লোক পরিবারের পানীয় জল প্রস্তুত করে। বালিকারাই প্রায় এই পারিবারিক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

যে দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উদ্ভিজ্জ জন্মে না, সে দেশের লোক কি খাইয়া জীবন ধারণ করে? এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। ফল মূল ও শস্যাদিই বাঙ্গালীদিগের প্রধান আহার্য্য! বাঙ্গালীর পক্ষে হিমান্ত প্রদেশে জীবন যাপন করা কল্পনারও বহির্ভূত বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু সে দেশের লোকেরা আমাদিগেরই

মত স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মৎস্য ও মাংসই তাহাদিগের প্রধান আহার। এক প্রকারের সামুদ্রিক মৎস্য এবং রেইণ্ডিয়ার নামক গো জাতীয় হরিণই হিমান্ত-প্রদেশবাসীদিগের জীবনের সম্বল। এক রূপ চর্ম্মাচ্ছাদন পরিধান করিয়া হিমান্ত প্রদেশের ধীবরেরা সমুদ্রজলে অবতরণ করে, তাহারা এমন সাহসী ও সন্তরণপটু যে, উত্তরসাগর-বাসী তিমি ও সিন্দুঘোটক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জলজন্তুদিগকে বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া অকাতরে সমুদ্রগর্ভে অবগাহন করে, এবং সীল নামক সামুদ্রিক মৎস্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া থাকে। হিমান্ত-প্রদেশবাসীরা এই সীল মৎস্যের মাংস আহার করিয়া, তাহার ত্বক দ্বারা একরূপ পরিচ্ছদও প্রস্তুত করিয়া লয়।

কিন্তু গো-হরিণই হিমান্ত প্রদেশবাসীদিগের জীবনের প্রধান অবলম্বন। উহারা গো-হরিণের দুগ্ধ ও মাংস ভক্ষণ করে, উহার চর্ম্ম ও লোমে বস্ত্র নির্ম্মাণ করে, এবং উহার বিষ্ঠা জ্বালাইয়া থাকে। এদেশে গাভী যেমন উপকারী, আরব দেশে উষ্ট্র যেমন পরম ধন, হিমান্ত প্রদেশে গো-হরিণও সেইরূপ। গো-হরিণের অভাবে তদ্দেশবাসীরা একরাত্রিও জীবিত থাকিতে পারে না; এই জন্য তাহারা প্রচুর পরিমাণে গো-হরিণ পুষিয়া

থাকে। সে দেশে পর্য্যাপ্ত তৃণপত্র জন্মে না বলিয়াও গো-হরিণ পোষা কঠিন হয় না। ঈশ্বরের এমন আশ্চর্য্য ব্যবস্থা, অনিবার শিশিরপাত হেতু সে দেশে ভূতলে অপরিমিত শৈবাল জন্মে, গো-হরিণেরা প্রধানতঃ তাহাই খাইয়া জীবন ধারণ করে।

হিমান্ত প্রদেশবাসীরা স্লেজ নামক একরূপ চক্রহীন গাড়ী প্রস্তুত করে। উহা নৌকার মত দীর্ঘাকার এবং উহার তলভাগ বেশ মসৃণ। গো-হরিণেরাই সেই সকল নৌ-শকট আকর্ষণ করিয়া থাকে। হিমান্ত প্রদেশে অধিকাংশ সময়ে ভূপৃষ্ঠে এবং নদী ও সমুদ্রের উপরে বরফের এমন কঠিন ও পুরু স্তর পড়ে যে, মানুষ অনায়াসে তাহার উপর দিয়া বহুভার লইয়াও গমনাগমন করিতে পারে। ঐ সকল নৌ-শকটের তলভাগ মসৃণ ও গো-হরিণগণ দ্রুতগামী বলিয়া হিমান্ত প্রদেশবাসীরা তুষার-বর্ত্মে অতি বেগে শকট চালাইয়া যায়।

প্রকৃত বন্ধুতা।

একদা অরণ্যপথে বন্ধু দুই জন,
মধুর প্রসঙ্গে রঙ্গে করিছে গমন

দুই বন্ধু পরস্পর সহোদর প্রায়
কত ভালবাসে দোঁহে, বাখানিছে তায়।
হেনকালে অকস্মাৎ বিপদ ঘটিল,
ভীষণ ভল্লুক এক এসে দেখা দিল !
উভয়েরে ভল্লুক করিল আক্রমণ,
এক বন্ধু বৃক্ষেতে করিল আরোহণ।
আত্মরক্ষা করি নিজে নিশ্চিন্ত হইল,
অপর বন্ধুর দশা কিছু না ভাবিল।
অপরের গাছে চড়া ছিল না অভ্যাস,
ভূতলে পড়িল ভয়ে হইয়া হতাশ,
"ভল্লুক না খায় মরা," ইহা শুনেছিল,
মরার মতন তাই পড়িয়া রহিল।
গর্জ্জন করিয়া কাছে ভল্লুক আসিল,
মুখ নাক চোক কান শুঁকিয়া দেখিল,
মৃত ভেবে ছেড়ে তারে চলি গেল দূরে।
বৃক্ষ হতে নেমে বন্ধু বলে ধীরে ধীরে,
"উঠ ভাই, চল যাই আর নাই ভয়,
বহু দূরে গিয়াছে সে পশু দুরাশয় ;
ভূতলে তোমারে বন্ধু পতিত দেখিয়া,
ভাবনায় মৃত-প্রায় বৃক্ষে আরোহিয়া ;
কিন্তু বড় কুতূহল হয় জানিবারে,

৬

কানে কানে ভল্লূক কি কহিল তোমারে ?”
বন্ধু বলে—“ভল্লূক যে কহিয়াছে কথা,
কভু করিব না আমি তাহার অন্যথা ;
“বিপত্তি কালেতে যেবা না হয় সহায়,
বন্ধু মনে কোন দিন করিও না তায়,”
এই কথা বার বার ভল্লূক কহিল,
ভাগ্যগুণে বাঁচিলাম, ভাল শিক্ষা হলো।”

গোধন।

গোধন পরম ধন এ দেশের তরে,
কহিতে সকল গুণ মুখে নাহি সরে !
তৃণ খেয়ে ক্ষীণ গাভী দুগ্ধ করে দান,
তাহাতেই বেঁচে থাকে মানুষের প্রাণ !
সকল সারের মধ্যে গোরস প্রধান,
অমৃত বলিয়া তাই তাহার বাখান।
ক্ষীর সর নবনীত পিষ্টক পায়স,
কত যে সুখাদ্য আরো মধুর সরস
দুগ্ধ হ'তে জন্মে, যাতে মুগ্ধ হয় মন,
একবার রসনায় করি আস্বাদন।

প্রখর ভানুর তাপে হয়ে দগ্ধ-প্রায়,
হলস্কন্ধে বলীবর্দ্দ মাঠ পানে ধায় ;
কঠিন বন্ধুর ভূমি ক'রে দেয় চাষ,
সারাদিন নাহি খায় এক মুষ্টি ঘাস ,
তবে সে কৃষক বীজ করয়ে বপন,
তবে সে জনমে ক্ষেত্রে শস্য অগণন ;
না হইলে অনাহারে মরে যত প্রাণী,
জীবের জীবন তাই গোধনে বাখানি।
প্রকাণ্ড শকট টানে পৃষ্ঠে বহে ভার,
গোরু করে মানুষের কত উপকার।
চক্ষু বেঁধে তৈলকার ঘানিগাছে যোড়ে,
তথাস্তু বলিয়া গোরু সারাদিন ঘোরে।
এইরূপে মানুষের শত প্রয়োজন,
গোরুর প্রসাদে দেখ হতেছে সাধন।
বিধাতার সৃষ্টি মধ্যে বড় চমৎকার,
বিষ্ঠায় দুর্গন্ধ নাশে, শেষে হয় সার !
বড় মূল্যবান বটে এমন গোধন ;
মূর্খ সেই, যেবা তারে না করে যতন।

বাষ্পীয় যন্ত্র।

বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি অবধি জনসমাজ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে বহুদিনের কার্য্য একদিনে সম্পন্ন হইতেছে, এক হস্ত শত হস্তের কার্য্য করিতেছে! মানুষ পূর্ব্বে আপনার বলে বহু কষ্টে ও বহু বিলম্বে যাহা করিয়া লইত, অথবা ইতর প্রাণী-দিগের উপরে অত্যাচার করিয়া যে কার্য্য উদ্ধার করিত, বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি অবধি অগ্নি ও জল প্রভৃতির উপর আধিপত্য করিয়া তাহা অল্পায়াসে, অল্প সময়ে ও উৎ-কৃষ্টতররূপে সম্পন্ন করিতেছে। বাস্তব বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি অবধি মানুষ যেন সত্য সত্যই দেবত্ব লাভ করি-য়াছে, পৃথিবী অপূর্ব্ব সুখ ও স্বচ্ছন্দতার স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

বাষ্পীয় যন্ত্রে গোধূম চূর্ণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত করে, ইষ্টক চূর্ণ করিয়া সুরকি প্রস্তুত করে, কাষ্ঠ ও লৌহ প্রভৃতি ছেদন, পীড়ন ও কুন্দন করিয়া নানা অস্ত্র ও নানা যন্ত্র এবং নানা প্রকার গৃহসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দেয়। নগরের পথে ঐ যে লৌহস্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে, উহার কর্ণ

ধরিলেই মুখ হইতে জল উদ্গীরণ করিবে, সে উহার নিজ গুণে নহে, বাষ্পীয় যন্ত্রই উহার কারণ। রাজপথে যে শত শত বায়বীয় দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্ধকার দূর করিতেছে, অট্টালিকার কণ্ঠমালা রূপে যে সুন্দর দীপমালা শোভা পাইতেছে, তাহাও বাষ্পীয় যন্ত্রের গুণে। আবার বাষ্পীয় যন্ত্র সভাগৃহে বা কার্য্যালয়ে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া সুবুদ্ধি পরিচারকের কার্য্যও করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্র পর্ব্বতের পাষাণ-বক্ষ ভেদ করিয়া বন্ধুর ভূমি খনন করিয়া জল-প্রণালী প্রস্তুত করিতেছে। আমরা যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, তাহার অনেকেই বাষ্পীয় যন্ত্র মুদ্রিত করিয়া দেয়; আমরা যে দূর দেশে যে পত্র প্রেরণ করি, তাহাও বাষ্পীয় যন্ত্র বহন করিয়া লইয়া যায়।

বাষ্পীয় যন্ত্রের অসাধ্য যেন কিছুই নাই। বাষ্পীয় যন্ত্র মানুষকে এক দিনে, এক মাসের পথে লইয়া যাইতেছে; বাষ্পীয় যন্ত্র যেমন পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতেছে, তেমনই আবার ক্ষুদ্র সূচিকা ও সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া, একদিকে অপার শক্তি ও অপরদিকে অসাধারণ নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে। কি সময় রক্ষা, কি নিরাপদ যাত্রা, কি সুন্দর গৃহসামগ্রী, কি পরিষ্কার জল, কি সুন্দর বস্ত্র, কি সুলভ গ্রন্থ, এ সমুদয়েরই জন্য আমরা বাষ্পীয় যন্ত্রের নিকট ঋণ-

গ্রস্ত। বাষ্পীয় যন্ত্র এত অদ্ভুত ও বিচিত্র কার্য্য সাধন করিতেছে, অথচ, উহা এক ভিন্ন দুই নহে। কি বাষ্পীয় পোত, কি জলের কল আর কি ময়দার কল, এ সকলই এক বাষ্পীয় যন্ত্র। তবে গতিকারক বাষ্পীয় যন্ত্র একটুকু অধিক কৌশলপূর্ণ। বাষ্পীয় যন্ত্র কিরূপ এবং কোন্ কোন্ মহাত্মাই বা বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া জনসমাজকে এমন সৌভাগ্যশালী করিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বাষ্পীয় যন্ত্র অতি অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহার কৌশলটী বুঝা বড় কঠিন নহে। জল উত্তাপ দিলে ধূমে পরিণত হয়; উত্তাপ আরও বৃদ্ধি করিলে ঐ ধূম আরও বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, এবং এইরূপে সূক্ষ্ম হইয়া যখন বায়ুর সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়া যায় যে, আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তাহাকে বাষ্প কহে। সমুদয় পদার্থই উত্তাপ পাইলে বিস্তৃত হইয়া থাকে। লৌহ যে এমন কঠিন, তাহাও দগ্ধ করিয়া রক্তবর্ণ করিলে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে। জল তরল পদার্থ, এজন্য সহজেই তপ্ত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। রন্ধন সময়ে হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিলে কতক্ষণ পরে ঐ সরা আপনা হইতেই পড়িয়া যায়। হাঁড়ির মধ্যস্থিত জল উত্তাপে বাষ্প-

রূপে বিস্তৃত হইয়া উঠে; আর যদি বাহির হইবার পথ না পায়, তাহা হইলেই আবরণ ঠেলিয়া ফেলিয়া ধাবিত হয়।

এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, জল তাপ-দ্বারা বাষ্প করিয়া উহা গতিশীল ও প্রচুর শক্তি-বিশিষ্ট করা যাইতে পারে। আর যদি এমন একটী কৌশলপূর্ণ পাত্র প্রস্তুত করা যায় যে, বাষ্প উত্তপ্ত হইয়া সেই পাত্রস্থিত কোন এক পথে প্রবল বেগে গতায়াত করে। তবে সেই গমন-পথের মধ্যস্থলে কোন দ্রব্য স্থাপন করিলে, তাহা বাষ্পবলে নিয়তই আন্দোলিত হইবে। বাষ্পীয় যন্ত্রের একটী অঙ্গকে পেষ্টন বলে; ঐ পেষ্টন বাষ্পদ্বারা নিয়ত আন্দোলিত হয়। পেষ্টনের সঙ্গে যন্ত্রের চক্রের এমন সুন্দর বন্ধন যে, সেই আন্দোলনেই চক্র ঘুরিয়া থাকে। বাষ্পীয় শকট এইরূপে চালিত হয়। বাষ্পীয় পোতে চক্রের অর সকল দাঁড়ের কার্য্য করিয়া থাকে। অন্যান্য অধিকাংশ যন্ত্রের এই চক্রের সঙ্গে চর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ নানা প্রকার উপকরণ থাকে; চক্রের গতিতে পরিচালিত হইয়া সে সকল গুলিই কার্য্য করিয়া থাকে। একটী বাষ্পীয় যন্ত্র যখন কার্য্য করে, তখন তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলেই অনেক বুঝিতে পারা যায়। আমরা যাহা লিখিলাম, তাহাতে কতকটা আভাস মাত্র পাওয়া যাইতে পারে।

ওয়াট্‌স্‌ নামক একজন মহাপুরুষ বাষ্পীয় যন্ত্রের নির্ম্মাতা। তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ বাষ্পদ্বারা নানা রূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ বা কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; কিন্তু রীতি-মত একটী বাষ্পীয যন্ত্র কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ওয়াটস্‌ নির্ম্মিত বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা অন্যান্য কার্য্য যত হউক না হউক, তৎকালে ইংলণ্ডের এক মহোপকার সাধিত হইত। ইংলণ্ডদেশ মৃদঙ্গার ও লৌহাদি ধাতুর আকরে পরিপূর্ণ। সেই সকল খনিতে জল উঠিয়া সময়ে সময়ে কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা ভূগর্ভ-স্থিত সেই জল নির্গত করিয়া ফেলা ভিন্ন, খনির কার্য্য চালাইবার আর উপায়ান্তর ছিল না। বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশের মহোপকার সাধন করতঃ মহাত্মা ওয়াটস্‌ প্রচুর ধন ও যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখনও গতিকারক বাষ্পীয় যন্ত্রের কোন কল্পনা মানুষের মনে ছিল না।

গতিকারক বাষ্পীয় যন্ত্রের নির্ম্মাতা মহাত্মা জর্জষ্টিফেন্‌-সন্‌ একজন দরিদ্র লোকের সন্তান। ইংলণ্ডের অন্তঃ-পাতী নিউকাসেল নগরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। জর্জ্জের পিতার ছয়টী সন্তান এবং বৃহৎ পরিবার ছিল। কয়লার খনিতে বাষ্পীয় যন্ত্রের অগ্নি

জ্বালাইবার কার্য্য করিয়া তিনি মাসে পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেন। ইংলণ্ডে যেরূপ ব্যয়বাহুল্য, তাহাতে এইরূপ অল্প আয় দ্বারা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করাই দুষ্কর ; সুতরাং জর্জ্জের পিতা সন্তানদিগের শিক্ষা-দান বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই। আট নয় বৎসর বয়সের সময় জর্জ্জ জনৈক প্রতিবেশীর গোরু চরাইতেন। কিছুকাল পরে তিনি হলচালনাদি কার্য্যে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন।

জর্জ্জ বাল্যকালাবধিই যন্ত্রাদির কার্য্য বড় ভাল বাসি-তেন ; সাত আট বৎসর বয়সেই তিনি মৃত্তিকা দ্বারা নানা প্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতেন। জর্জ্জের মনে বড় সাধ ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতার মত একটা কর্ম্ম পান। এই উদ্দেশ্যে কয়লার খনিতে নানারূপ কার্য্য কর্ম্ম করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি মাসিক পনের টাকা বেতনে পিতার সহকারী হইলেন। ইহার কিছু পরে, জর্জ্জ তাঁহার পিতার সম-বেতনভোগী হইয়া মনে করিয়াছিলেন—"অতঃপর আমি মানুষ হইয়াছি, কোন রূপে দিন যাপন করিতে পারিব।" কাহার জীবনে কখন কি হয়, কে বলিতে পারে? জর্জ্জ জানিতেন না যে, তিনি এককালে পৃথিবীর গুণীগণাগ্রগণ্য হইয়া জনসমা-জের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন।

ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই জর্জ আর এক পদে উন্নীত হইলেন। যন্ত্র যাহাতে ভালরূপ কার্য্য করে, এ সময়ে তাঁহাকে ইহাই দেখিতে হইত। জর্জ কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, যন্ত্রটী যেন তাঁহার ক্রীড়া-সামগ্রী হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ উহাকে খণ্ডে খণ্ডে খুলিয়া দেখিতেন, উহার নির্ম্মাণ ও কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতেন। ঐরূপ করিতে করিতে উহার নির্ম্মাণ ও কার্য্যকারিতা বিষয়ে তাঁহার পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত জর্জ ষ্টিফেন্‌সন্ অক্ষরজ্ঞান-বিরহিত ছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা ও যত্ন থাকিলে এইরূপ কালবিলম্বে অধিক কিছু যায় না। তিনি মন দিয়া লেখা পড়া আরম্ভ করিলেন। দিবসের মধ্যে তাঁহাকে দ্বাদশ ঘণ্টা যন্ত্রের কার্য্য করিতে হইত। সন্ধ্যার পর রজনী-বিদ্যালয়ে যাইয়া তিনি পাঠ ও বর্ণবিন্যাস শিখিতে লাগি-লেন। ঊনিশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি পরিষ্কার রূপে পাঠ করিতে এবং আপনার নাম লিখিতে শিখিয়াছি-লেন। অতঃপর তিনি অঙ্ক শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। যন্ত্রের পার্শ্বে বসিয়া যখন তিনি কার্য্য করিতেন, তখনও দুই একটী আঁক কসিতেন। এইরূপে গণিত-বিষয়েও পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

অল্প কাল পরে জর্জ আর এক পদ উন্নীত হইলেন। এবং স্থানান্তরে ভদ্রাসন পরিবর্ত্তন করিলেন। এই সময়েই নানা প্রতিকূল অবস্থাতে তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময়েই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইল; দৈব ঘটনাতে তাঁহার পিতা অন্ধ হইলেন। সে সময়ে ইংলণ্ড ভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল। দেশের রীতি অনুসারে জর্জ সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু বহু ব্যয় করিয়া একজন প্রতিনিধি প্রদান করিয়া মুক্তি পাইলেন। এসময়ে তিনি মাসিক চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়াছিল। এই মাতৃহীন শিশুর লালন পালন ও বৃদ্ধ জনক জননীর ভরণ পোষণ করা এরূপ অল্প আয়ে সুকঠিন হইয়া উঠিল। জর্জ কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িলেন, এবং আমেরিকায় যাইয়া বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। ইংলণ্ড দেশের সৌভাগ্য যে, পর্য্যাপ্ত পাথেয় সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে একটী ঘটনা ঘটিল। জর্জের কর্ম্মস্থানের অনতিদূরে কোন একটী খনি জলপূর্ণ হইয়া গেল; জল নির্গমের জন্য বহুচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া পড়িল। জর্জ এই সংবাদ পাইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং চেষ্টা করিয়া প্রতিবিধান নির্ণয় করিলেন।

অল্প সময়ে এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহার সুখ্যাতি রটনা হইতে লাগিল। তিনি অচিরেই বার্ষিক সহস্র মুদ্রা বেতনের এক কার্য্য পাইলেন। এই সময়ে গতিকারক বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মানের কল্পনা অনেকেরই মনে উপস্থিত হইয়াছিল : জর্জের মনেও হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কেবল চিন্তা করিবার লোক ছিলেন না; নানারূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি গতিকারক বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লিভর্‌পুল হইতে প্রথম বাষ্পীয় শকট মান্‌চেষ্টার নগরে গমন করে। এইক্ষণ সভ্য দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিতেছে। দরিদ্রের সন্তান জর্জ বাল্যকালে গোরু চরাইতেন; বুদ্ধি ও অধ্যবসায় যোগে তিনিই জগতের এই অপূর্ব্ব সুখের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন।

জন্মভূমি।

যে দেশে জন্মেছি আমি, বসি যেই দেশে,
যে দেশের বায়ু বহে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে;
যে দেশের রবি তাপ বিতরে আমায়,

যে দেশের স্রোতস্বতী সলিল যোগায় ;
যার ফলশস্যে করি জীবন ধারণ,
যার বক্ষে সদা সুখে করি বিচরণ ;
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান।

২

যে দেশে কৃষক মম জীবিকার তরে,
ভানু তাপে পুড়ি তনু ভূমি চাষ করে ;
সাধিবারে আমার অনেক প্রয়োজন,
যে দেশে বণিক করে বহু পর্য্যটন ;
যে দেশে লোকের কাছে শিখিয়াছি কথা,
পশু হইতাম যার হইলে অন্যথা ;
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান।

৩

যে দেশে রয়েছে মম প্রিয় পরিবার,
দয়াময় পিতা আর জননী আমার ;
স্নেহের পুতুল সম ভাই ভগ্নী যত,
এক বৃক্ষে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত !
যে দেশে খেলার সাথী আর বন্ধুগণ,
সুশোভিত আছে যেন নন্দনকানন ;

ধরাতলে আর কোথা আছে হেন স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

যে দেশের গিরি নদী কত শোভা ধরে,
খনি মধ্যে জ্বলে মণি, মুকুতা সাগরে,
অতুল নক্ষত্র-শোভা সুনীল আকাশে;
নব জলধর সহ সৌদামিনী হাসে ;
যে দেশে কাননে শোভে কত মত ফুল,
কল কণ্ঠে গায় গীত বিহঙ্গমকুল ;
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

যার অন্ন জল খেয়ে শরীর জীবিত,
যার নামে ধরাতলে সবে পরিচিত ;
যাহার গৌরবে কত সুখের উদয়,
যাহার পতনে হয় পতন নিশ্চয় ;
দূর দেশে থাকি যারে করিলে স্মরণ,
উথলে হৃদয় আর ঝরে দুনয়ন ;
তার তরে শরীরের রক্তবিন্দু দান
যে না করে, কৃতঘ্ন সে পশুর সমান !

৬

অসার শরীর আর অসার জীবন,
স্বজাতির হিত যদি না হয় সাধন ;
স্বদেশের ঋণ শোধ করিয়াছে যেই,
ইহলোকে পরলোকে ভাগ্যশীল সেই ;
খুলে দেখ ইতিহাস কত মহাবীর,
স্বদেশের হিত-হেতু পাতিলা শরীর ;
তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা রয়েছে ধরায়,
মুক্তকণ্ঠে যশোগীত কবিগণ গায়।

প্রকৃত বন্ধুতা ও প্রতিজ্ঞা পালন।

সিরাকিউস্ নগরে দায়োনিসিয়স্ নামে এক স্বেচ্ছাচারী নরপতি ছিল। যথেচ্ছাচার-শাসন ও নির্দ্দয় ব্যবহার দ্বারা সে প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিত। একবার কতকগুলি রাজ-কর্ম্মচারী চক্রান্ত করিয়া, দামন্ নামক একজন নির্দ্দোষী সাধু লোককে দায়োনিসিয়সের নিকট অপরাধী বলিয়া উপস্থিত করে ; দায়োনিসিয়স্ সবিশেষ বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিল।

এই নিষ্ঠুর ও অসম্ভাবিত দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে দামন্ বিস্মিত ও সন্তপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি দায়োনিসিয়সের চরিত্র অবগত ছিলেন। এই অসঙ্গত দণ্ডাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই বিবেচনায়, তিনি রাজসমীপে অন্য কোন অনুকম্পা যাচঞা না করিয়া কেবল এই প্রার্থনা করিলেন যে, সংসারের অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে তিন দিবস অবকাশ দেওয়া হয়। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দায়োনিসিয়স্ প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না, অনেক অনুনয় বিনয় করিবার পরে অবশেষে এই আদেশ করিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অনুপস্থিতি-কালের জন্য দামনের প্রতিভূ থাকে, আর দামন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হইলে তৎপরিবর্ত্তে মৃত্যু-দণ্ড গ্রহণে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেই দামন্ ঐ তিনি দিন সময় পাইতে পারে।

সকলেই মনে করিল, এই রাজ-আজ্ঞাতে কোন ফল ফলিবে না, অপরাধীর জন্য কেহই এমন শঙ্কটে পদার্পণ করিবে না। পিথিয়স্ নামে দামনের এক বন্ধু ছিলেন; তিনি অযাচিতরূপে বন্ধুর জন্য প্রতিভূ থাকিতে প্রস্তুত হইলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পিথিয়সের এইরূপ অকৃত্রিম প্রণয়ে পরাস্ত হইয়া, দামন্ নির্ব্বন্ধ-সহকারে বন্ধুকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিলেন।

দামন কহিলেন—“পিথিয়স্ এখান হইতে আমার গৃহ এক দিনের পথ দূরবর্ত্তী, বাড়ীতে যাইতে ও বাড়ী হইতে আসিতেই দুই দিন লাগিবে; আর এক দিবস মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করিব। সময় অতি সংকীর্ণ; যদি এই সংকীর্ণ সময়ে ফিরিয়া আসিতে দৈবগতিকে না পারি, তাহা হইলে কি ভয়ানক বিপদই ঘটিবে! পিথিয়স্, তুমি নিবৃত্ত হও, আমি তোমার ভালবাসায় ক্রীত হইয়াছি; আর তুমি এরূপ দুঃসাহস করিও না।” পিথিয়স কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বন্ধুকে বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। অগত্যা দামন্ গৃহে চলিলেন।

গৃহে যাইয়া এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিলে পরিবারবর্গ পরিতাপে আকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু দামন্ অধীর হইলেন না; তিনি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটী কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির ছিল, তাহার বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন; পরিবারবর্গকে যথাবিহিত আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিলেন; সম্পত্তি সম্বন্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন, এবং অবশেষে পুত্রকলত্রের নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া রাজধানীগমনের উদ্যোগ করিলেন। পরিবারবর্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল, কেহ বা ব্যাকুল হইয়া

তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। অনেক আত্মীয় প্রতিবেশীও দামন্‌কে গমনে বাধা দিল। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ দামন্‌ প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনে বা বন্ধুকে বিপদগ্রস্ত করিয়া স্বার্থরক্ষায় সম্মত হইবেন কেন? তিনি যথাসময়ে রাজধানী অভি-মুখে চলিলেন।

দামন্‌ও রাজধানী-যাত্রা করিলেন, আর প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া দামন্‌ একান্ত উৎ-কণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু অশ্বারোহণে অতি দ্রুতবেগে চলিলেন! পথিমধ্যে একটী নদী পার হইয়া যাইতে হয়। অবিরল বৃষ্টিবর্ষণে প্রবল স্রোতে সেই নদীর উপরে যে সেতু ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দামন্‌ মহাবিপদে পড়িলেন; কিন্তু হতাশ না হইয়া সন্তরণে সেই নদী পার হইলেন, এবং প্রাণপণে চলিতে লাগিলেন। অতঃপর দামন্‌ কয়েক জন দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, কোন ক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতেও উদ্ধার পাইয়া পুনরায় প্রাণপণে ছুটিলেন। পাছে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারেন, পাছে নিরপরাধে উপকারী প্রিয়তম বন্ধুর প্রাণবিয়োগ হয়, এই চিন্তায় দামন্‌ আত্মবিস্মৃত হইয়া-ছিলেন, এবং প্রাণপণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

দামনের অনুপস্থিতি-কালে দায়োনিসিয়স্‌ কারা-গারে যাইয়া পিথিয়সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, এবং নানা

কথার পরে, দামনের প্রতিভূ হইয়া পিথিয়স্ বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য কহিল,—"পিথিয়স্, স্বার্থই মানুষের পরিচালক ; বন্ধুতা. পরোপকার ও স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কথা, কেবল দুর্ব্বল ও মূর্খদিগকে প্রবোধ দিবার জন্যই জ্ঞানীগণ প্রচার করিয়া থাকেন।" পিথিয়স্ তখন স্থির স্বরে কহিলেন,—"মহারাজ, এমন কথা কহিবেন না ; আমি আমার নিজের অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস করি, প্রিয়তম দামনের সাধুতাতেও সেইরূপ বিশ্বাস করি। প্রিয় বন্ধু দামনের প্রাণ রক্ষা করিতে আমি সহস্র মৃত্যু শ্লাঘ্য জ্ঞান করিব। হায়, দৈব কি তাহার জীবন রক্ষার সহায় হইবেন! এই যে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, ইহা শত গুণে প্রবল হইয়া, এখানে আসিবার জন্য দামন্ যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সেই চেষ্টা ব্যর্থ করুক। আমা অপেক্ষা তাঁহার জীবনের মূল্য অধিক ; দামন্ জীবিত থাকিলে দেশের অধিকতর মঙ্গল হইবে। হে ঈশ্বর, দামন্‌কে তুমি রক্ষা কর!" পিথিয়সের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, এবং তাঁহার দেবোপম ভাব দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত দায়োনিসিয়স্ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, পিথিয়স্‌কে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। দায়োনিসিয়স্ ইতঃপূর্ব্বেই বধ্য-

ভূমিতে গিয়াছিল। ছয়টি শ্বেত অশ্ব দ্বারা পরিচালিত এক মহামূল্য শকটে উপবিষ্ট হইয়া দায়োনিনিয়স্ বধ্যভূমির কাণ্ড সন্দর্শন ও পিথিয়সের ভাবগতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। পিথিয়স্ বধ্যভূমিতে যাইয়া ফাঁসিকাষ্ঠের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আপনার মৃত্যুর উপ-করণ-দ্রব্যগুলির উপরে ক্ষণকাল দৃষ্টি করিয়া স্থির মূর্ত্তিতে উপস্থিত জনগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, দৈব আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন ; এই ক্ষণ আমি যে রক্তপাত করি-তেছি, তদ্দ্বারা প্রিয় বন্ধুর জীবন রক্ষা হইবে। কিন্তু হয়ত তোমাদিগের মনে দামনের সাধুতার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে ; আমি যদি সেই সন্দেহ দূর করিতে পারিতাম, তবে আমার এই মৃত্যু কি সুখের মৃত্যুই হইত ! গত কল্য হইতে প্রবল প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। দামন্ এই দুর্য্যোগ অতিক্রম করিতে পারি-তেছেন না ; তিনি পথিমধ্যে না জানি কতই চিন্তা ও আক্ষেপ করিতেছেন ! তাঁহার সত্যনিষ্ঠার উপরে কেহ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিও না, তোমরা সত্বরই তাঁহার সাধুতার পরিচয় পাইবে। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, পাছে তিনি আসিয়া উপস্থিত হন। হে ঘাতক, শীঘ্র তোমার কার্য্য সমাধা কর।

এই শোষোক্ত বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতেই জনতার পশ্চাদ্দিকে এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। দূর হইতে এক ব্যক্তির উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল, অল্পকাল মধ্যেই সকলে বলিয়া উঠিল,—"ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও বধ করিও না বধ করিও না।" মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে দামন্ আসিয়া ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অশ্বের মুখ দিয়া ফেণ নির্গত হইতেছিল। দামন আসিয়াই দুই বাহু প্রসারিত করিয়া প্রিয় বন্ধু পিথিয়স্‌কে বক্ষস্থলে ধরিয়া কহিলেন—"বন্ধু নিশ্চিন্ত হও আর ভয় নাই; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনাপেক্ষা প্রিয় বন্ধুর প্রাণ-রক্ষা হইল। এখন আর আমার দুঃখ নাই, এখন আমি অনায়াসে মরিতে পারিব। আহা! প্রিয়তম, তোমার জন্য আমি কতই না উৎকণ্ঠিত ছিলাম!" দামনের ক্রোড়ে থাকিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ও ভগ্নস্বরে পিথিয়স্ কহিলেন, "হায়, কি হইল! কোন্ নিষ্ঠুর দৈব তোমার অনুকুল হইয়া আমার উপরে এই বাদ সাধিল! কিন্তু যাই হউক, যদি প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে না পারিলাম, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি? এইক্ষণ তোমার সঙ্গেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব!"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দায়োনিসিয়স্ অবাক্ হইয়া গেল। তাহার হৃদয় দ্রব হইল, সে অশ্রুপাত করিল,

এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া বধ্য-স্থানে আসিয়া বন্ধু-দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "বেঁচে থাক, বেঁচে থাক; তোমাদিগের দুই জনের তুলনা নাই! তোমরা সাধুতার অকাট্য নিদর্শন স্বরূপ; ঈশ্বরই এইরূপ সাধুতার যথার্থ পুরস্কর্ত্তা। তোমরা সুখী ও যশস্বী হইয়া বাঁচিয়া থাক। তোমাদিগের দৃষ্টান্তে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, সদুপদেশ দ্বারা অতঃপর আমাকেও তোমাদিগের পবিত্র বন্ধুতার উপযুক্ত করিয়া লও!"

বায়ু-বাক্য।

-:*:-

জীবের জীবন আমি বায়ু নাম ধরি,
সমস্ত পৃথিবীময় করি পর্য্যটন;
আলস্য-বিহীন হয়ে নিজ কার্য্য করি,
বিধাতার বিধি আমি করি না লঙ্ঘন।

নবদুর্ব্বাদলে কিম্বা গিরিবর-শিরে,
আনন্দে অবনীধামে করি বিচরণ;
কভু সন্তরণ করি স্রোতস্বতী-নীরে,
কখনো সাগর-বক্ষে করি আস্ফালন।

কুসুম-সৌরভ কভু করি আহরণ,
মানবের নাসিকায় করি তাহা দান ;
কভু আমি জলবিন্দু করিয়া সিঞ্চন,
তাপদগ্ধ পথিকের জুড়াই পরাণ।

পতঙ্গের পক্ষতলে থাকি লুকাইয়া,
উড়াইয়া লই তারে ভানুর কিরণে ;
কখনো বা জাহাজের মাস্তুলে চড়িয়া ;
সাগর লঙ্ঘিয়া যাই হরষিত মনে।

প্রভাত-সময়ে মোরে যে করে সেবন,
চিরদিন বঞ্চে সেই স্বাস্থ্য আর সুখে,
দুর্গন্ধে দূষিত মোরে করে যেই জন,
রোগরূপে ভর করি বসি তার বুকে !

অন্তরীক্ষে মেঘ যত বিবিধ বরণ,
বিচিত্রতা পরিপূর্ণ চিত্রপট প্রায়,
আমি ভেঙ্গে দিলে হয় বৃষ্টি-বরষণ,
আমারি উপরে মেঘ হেথা সেথা যায়।

আমি যদি নাহি রহি কিছু কাল তরে,
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তবে মরে জীবগণ ;
নির্ব্বোধ যে জন মম পথ রোধ করে,
অন্ধকূপ-হত্যা-কথা জানে সর্ব্বজন।

আমার কিছুই দোষ কিম্বা গুণ নাই,
সদা কার্য্য করি আমি বিধির আদেশে ;
নিভৃতে কাননে কভু বাঁশরি বাজাই,
কভু মহাবাত্যারূপে যাই দেশে দেশে।

এইরূপ সৃষ্টির যতেক উপাদান,
নিজগুণে নিজ বলে কার্য্যকারী নহে ;
যাহারে যে কার্য্যে রত সর্ব্বশক্তিমান,
করেন, সে কার্য্যে সেই ব্রতী হয়ে রহে।

বিহঙ্গ-জাতি।

বিহঙ্গজাতি সৃষ্টির অতি রমণীয় পদার্থ। অভিনিবেশ সহকারে একটী বিহঙ্গ-দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিধাতার রচনা-কৌশলের শত শত নিদর্শন পাইয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। বিহঙ্গগণের রূপ-বর্ণন অসম্ভব। এত অসংখ্য বিহঙ্গ এরূপ বিচিত্র সৌন্দর্য্যে সুশোভিত যে, উল্লেখ করিতে গেলে তাহাতেই বৃহদাকার গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ বিহঙ্গদেহ মাত্রেই নয়নের অতি প্রীতিকর। কেমন সুলোন্নত বঙ্কিম গ্রীবা

দেশ, কেমন সুগোল মস্তক ও বৃন্তের মত চঞ্চুপুট, কেমন সরল ও সজীব চক্ষুর্দ্বয়, আর কেমন কদলী-পুষ্পের মত দেহটী ; যেন সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে ! ইহার উপরে আবার কোন কোন পক্ষীব মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট, কাহারও পশ্চাতে বিস্তীর্ণ পুচ্ছ, আর কাহারও বা সর্ব্বাঙ্গে এমন বর্ণচ্ছটা যে, দেখিলে নয়ন পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু বিহঙ্গদেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বিহঙ্গদেহের উপযোগিতাই অধিকতর আশ্চর্য্য। বিহঙ্গগণ বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইবে বলিয়া তাহাদিগের দেহ তদুপযোগীই হইয়াছে। বিহঙ্গদিগের দেহ অপেক্ষাকৃত অল্প ভারী। এইরূপ করিবার জন্য তাহাদিগের অস্থি ও পালক প্রভৃতি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, তন্মধ্যে অনেক পরিমাণে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। বিহঙ্গদিগের পা দুখানি সরল অথচ সরু সরু ; উড়িবার সময়ে উহারই বলে লম্ফ প্রদান করিয়া কিয়দ্দূর উত্থিত হয়, এবং তৎপরে বায়ুর উপরে পক্ষ-সঞ্চালন করিতে থাকে।

যখন কোন বিহঙ্গ আকাশপথে উড়িয়া যায়, তখন যেন একখানি ক্ষুদ্র তরণী অতি দ্রুতবেগে বায়ু-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। তখন উড্ডীয়মান বিহঙ্গের বক্ষস্থল তরণীর তলভাগের, পুচ্ছটী নৌকার

কর্ণের, পক্ষ দুইখানি দণ্ডের এবং চক্ষু দুইটী দিগ্দর্শন যন্ত্রের কার্য্য করে। আর যখন বিহঙ্গ উড্ডয়নে ক্লান্ত হইয়া তরুশাখায় উপবেশন করে, তখন যেন সেই ক্ষুদ্র তরণী নঙ্গর ফেলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল বলিয়া বোধ হয়।

বিহঙ্গদিগের সর্ব্বাঙ্গ সমুচিত পরিচ্ছদ-পরিহিত; উহারা তন্তুবায় বা রজকের মুখাপেক্ষা করে না। যে সকল পক্ষীকে আহারান্বেষণে বহুদূর গমন করিতে, বা বৃক্ষের উচ্চ শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে বল অধিক; যাহাদিগকে ভূতলেই অধিক বিচরণ করিতে হয়, তাহাদিগের পদদ্বয় সমধিক বলবান; যাহাদিগকে জলে সন্তরণ করিতে হয়, তাহারা লিপ্তপদ-বিশিষ্ট; যাহাদিগকে কর্দ্দমে বিচরণ করিতে হয়, তাহাদিগের পদদ্বয়, গ্রীবা ও চঞ্চু সুদীর্ঘ; যাহারা মাংসাশী, তাহাদিগের চঞ্চু ও নখর সবল ও বড়শী সদৃশ, যাহারা কঠিন ফলাদি ভাঙ্গিয়া আহার করে, তাহাদিগের চঞ্চু পেষণ-যন্ত্রবৎ; আর যাহারা জলজ শৈবাল অথবা ক্ষুদ্র কীটাদি ভক্ষণ করে, তাহাদিগের চঞ্চুপুট ছাঁকনির মত।

সংসারের কতকগুলি লোকের সঙ্গে কতকগুলি পক্ষীর বাহ্য লক্ষণের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কাক-

গুলি যেন উৎসবালয়ে অনাহূত ইতর লোকের মত কোলাহল করে; চটকগুলি যেন চঞ্চল বালকদিগের মত গণ্ডগোল ও দৌড়াদৌড়ি করে, ময়ূর যেন বাবু লোকের মত আপনার পরিচ্ছদ দেখাইয়া অহঙ্কার করে, আর সকলে তাহাকে বাহবা দেয় না বলিয়া, পাখসাট মারিয়া রাগ করিয়া অসারতার পরিচয় দেয়; বক যেন ভণ্ড ধার্ম্মিকের মত দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য ধীরে ধীরে পদনিক্ষেপ করে; চিল যেন দুষ্টবুদ্ধি ও দূরদর্শী রাজমন্ত্রীর মত কাহার মস্তকে আঘাত করিবে, সেই জন্যই ব্যস্ত থাকে; আর পেচক যেন অল্পবিদ্বান অহংকারীর মত চক্ষু স্থির ও গণ্ড স্ফীত করিয়া বসিয়া থাকে।

বিহঙ্গজাতি জনসমাজের অনেক উপকার সাধন করিয়া থাকে। কাক ও শকুনি প্রভৃতি পক্ষী দূরীত ভোজন করে। হংসজাতীয় পক্ষীরা শৈবাল ও কীটাদি ভক্ষণ করিয়া মানুষের পানীয় জল পরিস্কার করিয়া দেয়। পক্ষিদিগের অনেকেরই পালকে লেখনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল কীট লোকালয়ে স্বাস্থ্য ও ক্ষেত্রে শস্য নষ্ট করে, দধিকুল ও শালিক প্রভৃতি পক্ষী তাহাদিগকে ধ্বংশ করিয়া থাকে। ময়ূর ও গড়ুরাদি পক্ষী বিষাক্ত সর্পদিগকে বিনাশ করিয়া উদ্যান নিষ্কণ্টক করিয়া

থাকে। আরব ও আফ্রিকার মরুভূমিতে উটপক্ষী নামক এক জাতীয় পক্ষী ঘোটকের কার্য্য করে। একটী বলবান উটপক্ষী দুইজন মনুষ্যকে পৃষ্ঠে করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারে, উত্তপ্ত বালুকারাশিতে অনেকক্ষণ পর্য্যটন করিয়াও ক্লান্ত হয় না।

কোন কোন উটপক্ষী এত বৃহৎ যে, ভূমি হইতে উহার মস্তকের উচ্চতা পঞ্চ হস্ত হইবে। কোন কোন উটপক্ষী তীব্রগামী অশ্বকেও পশ্চাতে ফেলিযা চলিয়া যাইতে পারে। কোন কোন উটপক্ষীর পালক অতি কোমল ও বিচিত্র; ইউরোপীয় অনেক মহিলা উহা উষ্ণীষে পরিধান করিয়া থাকেন। চাতক পক্ষীর সুকোমল রঞ্জিত পালকগুচ্ছ মগেরাও শিরে পরিধান করে। এ দেশে ময়ূরপুচ্ছে অতি সুন্দর ব্যজন প্রস্তুত হয়। অনেক পক্ষীর মাংস ও পুরীষাদি ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিহঙ্গজাতি দ্বারা মানুষের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। যখন আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা মহাপুরুষ কলম্বস আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিস্তীর্ণ বক্ষে ভাসিতে-ছিলেন; জীবনের আশায় একরূপ হতাশ হইয়া যখন তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেছিল, তখন তিনি একদল স্থলচর পক্ষীকে উড্ডীয়মান দেখিয়া,

নিকটে স্থল আছে,—ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে যে,একবার বিপক্ষগণ রাত্রিযোগে অলক্ষিত-ভাবে রোমনগর আক্রমণ করে, কিন্তু পালিত রাজহংস-গণের কোলাহলে জাগরিত হইয়া নগররক্ষকেরা শত্রু-দিগকে ব্যর্থমনোরথ করিয়াছিল। পালিত পক্ষির দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন যুদ্ধে অবরুদ্ধ নগরবাসিরা শিক্ষিত কপোত-দিগের দ্বারা দূরবর্ত্তী আত্মীয় ও স্বপক্ষীয়দিগকে পত্র প্রেরণ করিয়াছে।

বিহঙ্গজাতি আর এক রূপে মানবের অতি মহৎ উপ-কার সাধন করিয়া থাকে। অনেক বিহঙ্গ সুস্বর ও সুমধুর সঙ্গীতে মানুষের মনকে তৃপ্ত ও উৎফুল্ল করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধু-পক্ষীরা পুষ্পকোটরে দীর্ঘ চঞ্চুপুট প্রবেশ করত মধুপান করিয়া যখন শিস্ দিতে থাকে, তখন যেন বংশীধ্বনি শ্রবণে চমকিয়া উঠিতে হয়। বসন্ত সমাগমে কোকিল যখন পঞ্চম স্বরে আকাশ পরিপূর্ণ করে, তখন সেই হৃদয়-বিদ্ধকর স্বর শুনিয়া কত ভাব, ও পূর্ব্বস্মৃতিরই উদ্রেক হইতে থাকে। দূর আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া পাপিয়া যখন স্বর-লহরী বর্ষণ করে, তখন অন্তঃকরণে কত অলৌকিক সৌন্দর্য্যের পূর্ব্বাভাসই জাগিয়া উঠে। নিবিড় নিকুঞ্জবনে লুক্কায়িত থাকিয়া ভৃঙ্গরাজ, বুলবুল প্রভৃতি

যখন সুমধুর স্বর বর্ষণ করে, তখন যেন বনদেবী তালে তালে নৃত্য করিতে থাকেন। বধূসখী যেন স্বর্গীয়-দূতের মত অবতীর্ণ হইয়াই "বউ কথা কও" বলিয়া ডাকিয়া বেড়ায়, এবং এইরূপে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারতবর্ষীয় রমণী-দিগকে আপনাদিগের অধিকার লাভে উত্তেজিত করে। আমেরিকায় বিদূষক পাখী নামে একরূপ পাখী আছে, তাহার সঙ্গীত ও অনুকরণ-নৈপুণ্যে মনুষ্যমাত্রকেই বিস্মিত হইতে হয়।

বিহঙ্গদিগের নিকট আমরা কতকগুলি আশ্চর্য্য শিক্ষা লাভ করিতে পারি। স্বাবলম্বন বিহঙ্গদিগের মহৎ গুণ; যাহারই চলচ্ছক্তি আছে, সেই বিহঙ্গই আপন ভরণ পোষণের জন্য পরের গলগ্রহ হয় না। একদিকে বিহঙ্গ-গণ এইরূপ স্বাধীন ও স্ব স্ব প্রধান, অপরদিকে তাহা-দিগের মধ্যে চমৎকার একতা। যখন কোন বিহঙ্গ বিপদ্-গ্রস্ত হয়, তখনই সেই জাতীয় বিহঙ্গেরা সকলে বিলাপ ও কোলাহল করিতে থাকে। যখনই কোন বিহঙ্গের শাবক কেহ অপহরণ করিতে যায়, তখনই তাহার স্বজাতীয়েরা সকলে মিলিয়া আততায়িকে আক্রমণ করে।

বিহঙ্গদিগের নিকট আমরা কর্ম্মঠতা ও নিপুণতা শিক্ষা করিতে পারি। কোন বিহঙ্গই পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী অলস "বাবুর" মত বসিয়া থাকে না;

অনেকেই বিশেষ শ্রমশীলতা ও নিপুণতা প্রকাশ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে বাবুই নামক পক্ষী, বিশেষ সহিষ্ণুতা ও নিপুণতার সঙ্গে কুলায় নির্ম্মাণ করে। ইংলণ্ডে দর্জ্জিকা পক্ষী নামে একরূপ পক্ষী আছে, তাহারা বৃক্ষের প্রশস্ত পত্র সূক্ষ্ম লতাদ্বারা সেলাই করিয়া বাসা প্রস্তুত করে। পক্ষিজাতি আমাদিগকে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও নির্লিপ্ততা শিক্ষা দিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। পক্ষীগণ যথাসময়ে কত যত্নে কুলায় নির্ম্মাণ করে, শিশু সন্তানগুলিকে কত স্নেহে লালন পালন করে, পরিশ্রমের সময়ে পরিশ্রম করে, আহারের সময় আহার করে, আর যখনই অবসর পায়, তখনই তরুশাখায় শীতল ছায়ায় বসিয়া আনন্দ ও স্ফুর্ত্তির সঙ্গে গান করিতে থাকে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া বিহঙ্গগণ রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা সম্ভোগ করে, আবার প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া ঈশ্বরের নাম গান করিয়া পুনরায় কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়।

সৃষ্টির অতি উপাদেয় পদার্থ, মানুষের বিশেষ উপকারী ও উপদেষ্টা বিহঙ্গদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞ ও পাষণ্ডের কার্য্য। আপনাদিগের নিষ্ঠুরতা ও কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদিগের প্রাণবধ করা, অথবা তাহাদিগের দুই একটী অনুকরণ-কৌশল

দেখিবার জন্য তাহাদিগকে জীবনের সুখে বঞ্চিত করিয়া রাখা, যার পর নাই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।

বাসন্তী শোভা।

১

শিশির হইল শেষ বসন্ত আইল ;
যখন যে দিকে চাই, বিষাদ জড়তা নাই,
নব নব শোভারাশি ধরণী ছাইল।

২

মধুর মলয়ানিল নিয়ত বহিছে ,
নদী হ্রদ সরোবর, নাচিতেছে তর্ তর্,
নব জীবনের কথা আনন্দে কহিছে।

৩

নাই আর কুজ্‌ঝটিকা, নীল নভোস্থল ,
সমুজ্জ্বল সুধাকর, জগতের মনোহর,
অগণ্য তারকাসহ করে ঝলমল।

৪

সুশোভিত তরুশিরে পল্লব মুকুল ;
দেখিলে নয়ন হরে, গন্ধে আমোদিত করে,
কত শোভে সহকার কিংশুক বকুল।

৫

প্রান্তরে কাননে কত কুসুম ফুটিছে ;
ধরা-বক্ষ বিদারিয়া, একে একে সারি দিয়া,
যেন কোটী মণি-শ্রেণী ফুটিয়া উঠিছে !

৬

ফুটেছে গোলাপ যুথী মালতী মল্লিকা ;
বিকশিত যথা তথা, অতসী অপরাজিতা,
মুচকুন্দ গন্ধরাজ কুন্দ মন্দারিকা।

৭

মকরন্দ পান করি ছুটিতেছে অলি,
গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে, ভাবুকের মন হরে ,
উঠিছে কানন ভরি কোকিল-কাকলি ।

৮

নিবিড় পল্লবতলে অদৃশ্য থাকিয়া,
হেরে জগতের শোভা, পরাস্ত নয়ন-আভা,
"চোক্ গেল" বলে শুধু ডাকিছে পাপিয়া।

৯

স্বর্গীয় দূতের মত অন্তরীক্ষে থাকি,
ব্যথিত নারীর ক্লেশে, হেরি এই মহোল্লাসে,
"বউ কথা কও" বলে ডাকে বধূসখী।

১০

কখনো শিশিরে ধরা অর্দ্ধমৃতপ্রায়,
নিদাঘে মার্ত্তণ্ড-করে, কভু তারে দগ্ধ করে,
কভু হয় অভিষিক্ত বরষা-ধারায়।

১১

কি আশ্চর্য্য বিধাতার বিচিত্র রচনা ;
পুলকে পূর্ণিত মন, করি যবে দরশন,
এ কৌশল, মুখে আর বচন সরেনা !

১২

ঐন্দ্রজালিকের ক্ষুদ্র পেটিকার প্রায়,
এ বিশ্ব বিধির করে, নিত্য নব রূপ ধরে,
সহসা সাজিল তাই বাসন্তী শোভায়।

মুদ্রাযন্ত্র ও বঙ্গভাষা।

মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা জনসমাজের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা যেমন নানা প্রকারের কল কৌশল নির্ম্মিত হইয়া বাহ্য উন্নতির সুবিধা হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র দ্বারাও সেইরূপ

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইয়া মানুষের মানসিক উন্নতির অসীম সুবিধা হইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলেই আমরা মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে মানুষকে সকল গ্রন্থই হাতে লিখিয়া লইতে হয়; মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল দেশের লোকই সকল গ্রন্থ হাতে লিখিয়া লইত। একখানি বড় পুস্তক হাতে লিখিয়া লওয়া সহজ নহে। একশত পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি পুস্তক যে সময়ের মধ্যে এক ব্যক্তি হাতে লিখিয়া লইতে পারে, সাত আট জন লোক পরিশ্রম করিলে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই সময়ের মধ্যে সেইরূপ পঞ্চাশ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারে। বহুলোক একত্র হইয়া উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র সহযোগে পরিশ্রম করিলে, এক ব্যক্তির পরিশ্রমে একদিনে যত লেখা মুদ্রিত হইতে পারে, হস্তে লিখিতে হইলে সেই ব্যক্তি সমস্ত জীবনকালেও তাহা লিখিয়া উঠিতে পারে না।

মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কাগজ নির্ম্মাণেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন লোকে গ্রন্থ সকল হাতে লিখিয়া লইত, তেমনই গ্রন্থ প্রস্তুতের জন্য কাগজ হাতে তৈয়ার করিত। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে লোকে তাল পত্রে ও তুলট-কাগজে পুস্তকাদি লিখিয়া লইত। এইক্ষণ ডিমাই,

রয়েল, ও সুপার-রয়েল প্রভৃতি নানা প্রকার আকারের অনেকরূপ কাগজ আমরা দেখিতে পাই; শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে প্রায় কেহই উহার নামও জানিত না। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়াই কাগজ এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুলভ হইয়াছে। আমাদিগের দেশের অনেক কাগজই জর্ম্মনী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত হয়। কলিকাতার নিকট বালি ও টীটাগড় নামক স্থানে দুইটী কাগজের কল আছে, উহাতেও নানা প্রকারের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টির পূর্ব্বে শিক্ষার্থী ও সাহিত্য-ব্যবসায়িদিগের যে কিরূপ অসুবিধা ছিল, দুই একটী গল্প শুনিলেই বুঝা যাইবে। আমরা একখানি পুরাতন রামায়ণ গ্রন্থ দেখিয়াছি; প্রায় একশত বৎসর হইল ঐ গ্রন্থ হস্তে লিখিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র এদেশে আসিবার পূর্ব্বে সকল গ্রন্থই ঐরূপে লিখিত হইত। সেই গ্রন্থের আরম্ভে এবং শেষে নানা দেব দেবীকে স্মরণ ও সাক্ষী করিয়া এইরূপ ভাবের ভূরি ভূরি দিব্য ও অভিশাপ লিখিত রহিয়াছে যে, "যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ অপহরণ বা গ্রন্থের কোন ক্ষতি করিবে, তাহাব কুষ্ঠরোগ হইবে, বা তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে"! ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া

আমাদিগের হাস্যোদ্রেক হয় বটে, কিন্তু তৎকালে একখানি গ্রন্থকে লোকে ঐ রূপ মূল্যবানই মনে করিত। সকলের হাতের লেখা সুন্দর হয় না, এজন্য সকলে পুস্তক লিখিতে পারে না। যাহার হস্তাক্ষর সুন্দর, তেমন একজন লোক এক বৎসর, দুই বৎসর বা ততোধিক কাল রীতিমত গুরুতর পরিশ্রম করিয়া একখানি পুস্তক লিখিলে, তাহাকে মূল্যবান সম্পত্তি কেন মনে না করিবে? এখন যেমন একখানি গ্রন্থ নষ্ট হইলে অল্প ব্যয় করিয়াই অচিরাৎ সেইরূপ আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তখন তেমন পাওয়া যাইত না। কথিত আছে, বিলাতে এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি হইতে নকল করিয়া লইবার জন্য একখানি বাইবেল গ্রন্থ লইয়াছিল। দাতার নিকট নেতাকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া পুনঃ পুনঃ শপথ করিতে হইয়াছিল, আর ক্ষতিপূরণের আশঙ্কায় মূল্যবান এক ভূসম্পত্তিও বন্ধক রাখিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বে লোকে শ্লোক বা কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত; তাহাতে সেই সকল শ্লোকাদি যেমন, তেমনই থাকিত। পুস্তক লেখার প্রথা প্রচলিত হইলে লোকে সে চেষ্টা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। কেননা গ্রন্থ খুঁজিলেই যাহা পাওয়া যাইবে, কষ্ট করিয়া তাহা মুখস্থ করিবার দরকার কি? একটুক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু

এই সময়ে কতকগুলি প্রতারক লোক আপনাদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্য মনোমত শ্লোকাদি রচনা করিয়া ভাল ভাল গ্রন্থ মধ্যে বসাইয়া দিতে লাগিল! এইরূপে আমাদিগের দেশের শাস্ত্র সকল অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে এখন আর তেমন প্রতারণা চলিতেছে না। মুদ্রাযন্ত্রে এক রকমের গ্রন্থ একবারে সহস্র সহস্র মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে সহজে প্রতারণা চলিতে পারে না, এবং প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিলেও সহজেই ধরা পড়ে।

চীনদেশীয় লোকেরা প্রাচীন কালে জ্ঞান ও সভ্যতায় বড় উন্নত হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, চীনেরাই সর্ব্বাগ্রে মুদ্রা-যন্ত্রের কৌশল আবিষ্কার করে। কিম্বদন্তি এইরূপ যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চীন দেশে ফুংতেও নামে একজন রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেখিলেন; রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় আদেশ ও বিজ্ঞাপনাদি এত অসংখ্য যে, উহা হাতে লিখিয়া কার্য্য চালান অসম্ভব। অনেক চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, সেই সকল আদেশ ও বিজ্ঞাপন কাষ্ঠে খোদিত করিয়া ছাপাইয়া দিলে কার্য্য সহজ হয়। অতঃপর তিনি ঐরূপই করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে চীন দেশে পীচিং নামে একজন বুদ্ধিমান কর্ম্মকার বাস করিত।

সমস্ত হুকুম কাঠে খোদাই করা অপেক্ষা, বর্ণমালার অক্ষরগুলি স্বতন্ত্র খোদিত করিলে কার্য্যের অধিক সুবিধা হয় বিবেচনায়, পীচিং মাটিদ্বারা ঐরূপ অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল।

কিন্তু মুদ্রণ-কৌশল প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া, চীনদেশেই মুদ্রাযন্ত্রের সমধিক উন্নতি হয় নাই। গুটেন্‌বর্গ নামক জর্ম্মনী দেশীয় একজন প্রতিভাশালী লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিও প্রথমে খোদিত কাষ্ঠ হইতে ছাপা তুলিতেন। হাতে ছাপা না তুলিয়া যন্ত্রদ্বারা তুলিলে সহজে অধিক কার্য্য হইতে পারে বিবেচনায়, তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি যন্ত্রের কল্পনা করিলেন, এবং সাম্প্যাক্ নামক একজন সূত্রধরের দ্বারা একটী কাষ্ঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। ফষ্ট্ নামক একজন স্বদেশীয় সহযোগী গুটেন্‌বর্গের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ আনুকুল্য করিয়াছিলেন। কাষ্ঠের ছাপাখানা প্রস্তুত হইবার দুই বৎসর পরে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে কষ্টার্ নামে আর একজন বুদ্ধিমান লোক সতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই প্রথম মুদ্রিত পুস্তক এখন আর প্রায় পাওয়া যায় না।

অল্প কাল হইল উহার একখণ্ড আমেরিকায় নিউ-ইয়র্ক নগরে আঠার হাজার টাকাতে নীলামে বিক্রয় হইয়াছে!

ইংরাজেরা জর্ম্মানদিগের নিকট এবং বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগের নিকট মুদ্রণ-কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌ষ্টন্ নামক একজন ইংরাজ কলোন্ নগরে যাইয়া বহু পরিশ্রমে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহাকে একটী ছাপাখানা স্থাপন করিবার অনুমতি দেন। "ওয়েষ্টমিনিষ্টার্ এবি" নামক ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ গির্জ্জাতে সেই ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রায় এক শত বৎসর হইল বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রিত হইযাছে। চার্লস্ উইল্কিন্স্ নামক একজন সাহেব বহু যত্ন করিয়া এ দেশের নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত শিল্পনিপুণ ও অধ্যবসায়শালী ছিলেন। সেই মহাত্মাই সর্ব্বপ্রথমে স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া এক শাট্ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিযাছিলেন। উহার কিয়ৎকাল পরে মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি প্রভৃতি কয়েকজন মহাশয় লোক এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া এ দেশীয় নানা ভাষায পুস্তক প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারা কেবল বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রিত করিবার কৌশল প্রচার করেন নাই,

বহু পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালাতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য লেখার প্রণালীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থাদি এখন প্রায় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যতকাল বঙ্গভাষা প্রচলিত থাকিবে, এ দেশে তাঁহাদিগের নাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে, মহাত্মা কেরি তদীয় সহযোগী-দিগের অগ্রণী ছিলেন, এজন্য তাঁহার নিকটেই আমরা অধিকতর ঋণগ্রস্ত।

বাঙ্গালার বর্ষা।

আইল বরষাকাল,
নদ নদী বিল খাল,
নূতন সলিলে সব পরিপূর্ণ হইল;
অবিরাম হয় বৃষ্টি,
বুঝিবা নাশিবে সৃষ্টি,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন কোটীছিদ্র হইল!

ঠুশ্ ঠাশ্ পড়ে শীল,
মরে কত কাক চিল,
গোষ্ঠ ছেড়ে ধায় গাভী পেয়ে মহাত্রাস ;
আকাশের দুষ্ট ছেলে,
যেন সবে ঢেলা ফেলে,
পৃথিবীর ফলশস্য করিতেছে নাশ !
তর্ তর্ সর্ সর্,
বায়ু বহে নিরন্তর,
বৃক্ষশাখা হতে জল ঝুড়্ ঝুড়্ পড়িছে ,
শোকভরে তরু যেন,
নিশ্বাস ছাড়িছে ঘন,
নয়নেতে অশ্রুবিন্দু ঝর্ ঝর্ ঝরিছে ।
প্রান্তরে কৃষকগণ,
করি সবে প্রাণপণ,
করিতেছে কৃষিকার্য্য রাজ্য যাহে বাঁচিছে ,
পায়েতে লেগেছে জোঁক,
গায়ে লাগে শুঁয়পোক,
তথাপি চাষার মন আশাভরে নাচিছে ।
বিহঙ্গ-পতঙ্গগণ,
বিষাদিত অনুক্ষণ,
নিবিড় শাখার তলে বসে শুধু থাকিছে ,

কেবল সময় পেয়ে,
পেট পূরে জল খেয়ে,
চাতক "দে জল" বলি জলধরে ডাকিছে।
যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তার পাশে,
পঙ্কিল সলিল পানে মণ্ডুকেরা ধাইছে,
আনন্দে সাঁতার দিয়ে,
মাথা মাত্র ভাসাইয়ে,
উচ্চনাদে বরষার কত গুণ গাইছে।
নব জলধর সঙ্গে,
সৌদামিনী কত রঙ্গে;
মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে বড়ই সুন্দর
জলদ অনেক স্নেহে,
লুকায়ে আপন দেহে,
গদ গদ ভাষে তার বাড়ায় আদর।
সেই শোভা নিরখিয়া,
নিজ পুচ্ছ বিস্তারিয়া,
ময়ূর ময়ূরী নাচে আমোদে বিহ্বল,
কভু নাচে তালে তালে,
কভু কদম্বের ডালে,
বসি উচ্চ কেকারবে করে কোলাহল।

ফুটেছে হিঁজল ফুল,
যেন বঙ্গবধূকুল,
নিবিড় অরণ্য মাঝে আছে লুকাইয়া
অপরূপ রূপ ধরে,
গন্ধে আমোদিত করে,
অনাদরে ঝ'রে প'ড়ে যেতেছে পচিয়া।
জলে গর্ত্ত গেল ভরে,
ক্রমি কীট দায়ে পড়ে,
লোকালয়ে তরুপরে লইল আশ্রয় ;
মশকেরা গায় গীত,
মক্ষিকারা হরষিত,
কুলায়ে ডাহুক ডাকে তুষ্ট অতিশয়।
আজি যেই জন দুখী,
কালি সেই হয় সুখী,
এইরূপে যাইতেছে জীবের জীবন ;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে,
আসিতেছে পরে পরে,
করিবারে জগতের মঙ্গল সাধন

বাঙ্গালা সংবাদপত্র।

মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে সংবাদপত্র চলিতে পারে না। বহু কষ্টে বহু লোকে হাতে লিখিয়া একখানি সংবাদপত্র চালাইতে চেষ্টা করিলেও, তাহাতে তত কার্য্য হইতে পারে না। এক এক খানি সংবাদপত্রের গ্রাহক-সংখ্যা এত অধিক, এবং উহার আয়তনও এত বড় যে, কয়েক বৎসরের কাগজ বিছাইয়া দিলে একখানি দেশ ঢাকিয়া ফেলা যায়। ইংলণ্ডে টাইম্‌স্‌ নামক সংবাদপত্রের আকার বড়, উহা প্রতিদিন তিনবার করিয়া মুদ্রিত হয়, উহার লক্ষ লক্ষ গ্রাহক, এবং উহার বার্ষিক আয় কোটী মুদ্রারও অধিক।

সচরাচর তিন প্রকারের মুদ্রাযন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রাকরেরা হাতে টানিয়া যাহাদ্বারা ছাপা উঠায়, তাহা একরূপ মুদ্রাযন্ত্র। দ্বিতীয় প্রকারের যন্ত্রের চাকা হাতে ধরিয়া ঘুরাইলে, উহাতে ছাপা হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রাযন্ত্রের সেই চক্র বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। যে সকল সংবাদপত্র বহুসংখ্যক মুদ্রিত করিতে হয়, প্রথম প্রকারের মুদ্রাযন্ত্রে তাহার কার্য্য কোনরূপেই হইয়া উঠে না।

সংবাদপত্র দ্বারা সমাজের অনেক উপকার হইয়া থাকে। সংবাদপত্র মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি ও ভাষাশিক্ষার প্রধান উপায়। সংবাদপত্রে নানা বিষয়ক তত্ত্ব ও উপদেশ থাকে, তৎপাঠে অভিজ্ঞতা ও নীতিজ্ঞান লাভ হয়। ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অনেক লোকেরই হয় না। সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, অল্পে অল্পে বড় বড় গ্রন্থ পাঠ করিবার কার্য্য হইয়া থাকে। সংবাদপত্রে নানা প্রকার বিষয় সকল লিখিত থাকে বলিয়া, পাঠ করিতেও সহজে রুচি জন্মে।

সংবাদপত্র দ্বারা আরও অনেক প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে। সংবাদপত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশের কল, কৌশল ও পণ্যদ্রব্যাদির সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়াতে, সমাজে কৃষি ও বাণিজ্যাদির বিস্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সংবাদপত্র দ্বারা আর এক মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্র সাধারণ মত গঠন ও প্রচার করিয়া থাকে। সংবাদপত্রে ধর্ম্ম, নীতি ও আচার ব্যবহারের যে সমালোচনা হয়, উহাতে সর্ব্বসাধারণের মত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা সামাজিকদিগের মত ও রুচি গঠিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে রাজা বা রাজপুরুষদিগের গুপ্ত চর

থাকিত। সেই সকল চর বা দূত নগরে নগরে এবং পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া দেশবাসীদিগের অবস্থা ও মতামত অবগত হইত, এবং সেই সকল বিষয় রাজা বা রাজপুরুষদিগকে জ্ঞাপন করিত। তাঁহারা সেই সকল বিষয় অবগত হইয়া যথোচিত কার্য্য করিতেন। সংবাদ-পত্র বর্ত্তমান সময়ে সেই দৌত্যকার্য্য করিতেছে; প্রজা সাধারণের অবস্থা সংবাদপত্র এখন রাজপুরুষদিগের গোচর করিতেছে, রাজপুরুষগণ কোন অন্যায় অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেও সংবাদপত্রই এখন তাহার প্রতি-বাদ করিয়া থাকে।

সংবাদপত্র অত্যন্ত উপকারী বটে, কিন্তু যে সকল সংবাদপত্র অশ্লীল রহস্য বা পরনিন্দাতে পরিপূর্ণ, তাহা পাঠ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাদৃশ সংবাদপত্র পাঠ করিলে বালক বালিকাদিগের চরিত্র নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীরামপুরে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা কার্য্য করিয়াছিলেন, প্রস্তাবান্তরে উল্লেখ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে মার্সম্যান সাহেব ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাচারদর্পণ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই লিখিত হইত। এ দেশীয় লোকের মধ্যে মহাত্মা রামমোহন রায়ই প্রথম

সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৌমুদী নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করেন।

রামমোহন রায়ের সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি কৌমুদী পত্রিকা লিখিতেন। রাম-মোহন রায়ের সঙ্গে মতের অনৈক্য হওয়াতে, তিনি স্বতন্ত্র হইয়া ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার-চন্দ্রিকা নামে আর একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকর নামে একখানি পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে গদ্য পদ্য উভয়ই লেখা হইত। এককালে প্রভাকরের বড় প্রভা ছিল। ইহার পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোম-প্রকাশ ও এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি পত্র প্রচারিত হইয়া বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালি জাতির বিলক্ষণ উপকার হইয়াছিল। চারুপাঠ ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রণেতা মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, বার বৎসর পর্য্যন্ত তত্ত্ব-বোধিনীর সম্পাদক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যত উপকার হইয়াছে, এমন আর কিছু-তেই হয় নাই।

রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব

মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়েরা বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রচার করিয়া, বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালি জাতির যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র চলিতেছে, তাহার উল্লেখ করিবার প্রযোজন নাই।

পূর্ব্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না। সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইত, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারী অগ্রে তাহা দেখিয়া দিতেন। এইরূপ করিলে লোকে স্বাধীন ভাবে মনের কথা লিখিতে পারে না বলিয়া, সভ্য দেশে সংবাদপত্রের উপরে এইরূপ শাসন নাই। মেট্‌কাফ নামক উদারাশয় গবর্ণর জেনারেলের শাসনকালে, সংবাদ পত্র এ দেশে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রচার করিয়া, রাজ প্রতিনিধি মেট্‌কাফ্‌ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

দেহ-নগর।

——:*:——

অদ্ভুত সহর আছে দেহের ভিতরে;
আশ্চর্য্য দেখেছি আমি গিয়ে সে সহরে,—

শিরায় শোণিত চলে যেন কলের জল,
লোমকূপ নর্দ্দামাতে সরিতেছে মল ;
গ্যাসের আলোক আছে স্ফটিকের ঘরে,
সহর আলোকময় ভিতর বাহিরে।
মধ্যেতে বাজার তাতে গলি শত শত,
আম্‌দানি রপ্তানি তাতে হতেছে নিয়ত।
ঊর্দ্ধে আছে মহাদুর্গ দুর্ভেদ্য প্রাচীর,
তাহাতে আছেন জ্ঞানচন্দ্র মহাবীর ;
ক্রোধ লোভ মদ আদি কয়টা দুর্জ্জন,
অন্ধকারে পথিকেরে করে জ্বালাতন ;
সম দম সহিষ্ণুতা তিতিক্ষা সবাই
সাধু লোক, সঙ্গে পেলে কোন ভয় নাই !
বিবেক বিচারপতি ন্যায়পরায়ণ,
নিয়ত করেন বসে দুষ্টের দমন।
নগরের রাজা কিন্তু বড় দয়াময়,
রাজ-দরবারে যেতে নাহি কোন ভয় ;
সর্ব্বত্র আছেন তিনি সকল সময়,
অপরূপ ভাব তাঁর কহিবার নয় !

——:•:——

দারিদ্র্যাসুরের দর্প।

১

"দারিদ্র্য" আমার নাম দুঃখ মোর ভাই,
সঙ্গে সঙ্গে যায় সদা আমি যথা যাই ;
যেই দেশে যাই তারে করি ছারখার,
কে পারে সহিতে ঘোর দংশন আমার ?
সুখ শান্তি নাহি রহে আমার পরশে,
গুণীরে নির্গুণ করি চক্ষুর নিমেষে ;
যে দেশে বসতি আমি করি দিন চারি,
সে দেশের মানুষে পশুর সম করি।

২

রোগ শোক দুই পুত্র পিতৃ আজ্ঞাকারী,
কুরুচি কুচিন্তা মম দুইটী কুমারী ;
আমি যথা রাজ্য করি তারা তথা থাকে,
মম পদানত তারা করে যত লোকে ;
দারুণ জঠর-জ্বালা চির সহচরী,
অগ্রে অগ্রে যায় মম পথ আলো করি ;
বীরের বীরত্ব নাশি, জননীর স্নেহ,
মানীর সম্মান যায়, নাহি বাঁচে কেহ।

৩

আলস্য-নিদ্রায় রত যে সকল জাতি,
কৃষি শিল্প বাণিজ্যেতে নাহি মাত্র মতি,
সে সকল দেশে আমি করি চিরবাস,
ভাল নামে যাহা পাই, সব করি গ্রাস,
মানুষের রক্ত পান করি বড় সুখে,
চিবাই মস্তিষ্ক বসি ভর করি বুকে!

—:-:—

রাণী ভবানী।

মহৎ লোকের জীবনী-পাঠে বালক-বালিকাদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। এই সংসারে প্রতিকূল অবস্থা ও আপদ বিপদের সঙ্গে মনুষ্য মাত্রকেই, অল্প বা অধিক পরিমাণে সংগ্রাম করিতে হয়। সেই সংগ্রাম করিবার সময়ে বন্ধু ব্যক্তির পরামর্শ যেমন কার্য্যকারী মহৎ লোকের জীবনবৃত্তান্ত-পাঠও সেইরূপ উপকারী। কেন না কার্য্যক্ষেত্রে বিঘ্ন বিপদের সঙ্গে কিরূপে সংগ্রাম করিয়া মহৎ লোকেরা সংসারে জয়ী হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে, সকলেরই পক্ষে কৃতকার্য্য হইবার সুযোগ হইতে পারে।

সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় ব্যতীত প্রায় কেহই মহৎ হইতে পারে না। কার্য্য করিতে করিতে মানুষ যখন পরিশ্রান্ত হয়, অথবা বারম্বার বাধা প্রাপ্ত বা অকৃতকার্য্য হইয়া, মানুষের প্রাণ যখন হতাশ হইয়া পড়ে, তখন মহৎ লোকের জীবনচরিত পাঠ করিলে সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়, এবং সাহস ও অধ্যবসায় বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। একজন প্রধান কবি কহিয়াছেন যে, আমাদিগের জীবনের কার্য্যক্ষেত্র যেন বালুকাময় প্রান্তরের মত, মহৎ লোকের জীবনচরিত ঐ বালুকার উপরে পদচিহ্ন সদৃশ, ঐ পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিলে আমরাও অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে পারি।

সকল দেশেই এবং সকল কালেই, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত বড় লোকের জন্ম হইয়াছে। ইতি-হাস সেই সকল বড় লোকের জীবনচরিত বই আর অধিক কিছুই নহে। প্রাচীন লোকদিগের নিকট আমরা পুরাতন কালের বিবরণ শুনিতে পাই। ইতিহাস অতি বিচক্ষণ প্রাচীন লোকের মত, আমাদিগকে পুরাতন কালের অবস্থা বিদিত করিয়া দেয়। ইতিহাসের নিকট আমরা যাহা অবগত হই, তন্মধ্যে মহৎ লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত অতি মূল্যবান সামগ্রী

অনেকে ইতিহাস পাঠ করিতে জানে না। তাহারা

কেবল ইতিহাসের লিখিত ঘটনাসকলের সময় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, আর কোন্ রাজার মৃত্যু হইলে কে কোন্ দেশের সিংহাসন পাইল, কোন্ যোদ্ধা কোন্ যুদ্ধে জয়ী হইল, প্রায় এ সকল জানিয়া রাখিতে পারিলেই, ইতিহাস পাঠ করা হইল মনে করিয়া থাকে। বাস্তব ইতিহাস পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিতে হইলে, কেবল রাজা বা যোদ্ধাদিগের নাম বা ঘটনা সকলের সময় জানিলে চলে না। কোন্ দেশে বা সমাজে কিরূপে রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, শিল্প ও সাহিত্যের কতদূর পরিবর্ত্তন, উন্নতি বা অবনতি হইয়াছিল, তাহা অবগত হইয়া জ্ঞান লাভ করা, এবং ইতিহাসের লিখিত বড় বড় লোকের জীবনী পাঠ করিয়া নিজ জীবন উন্নত করিতে যত্ন করার জন্যই ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন। সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির তত্ত্ব বালক বালিকারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, এজন্য কেবল বড় বড় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করাই তাহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য।

প্রায় সকল দেশেরই ইতিহাস আছে। বর্ত্তমান সময়ে সভ্যদেশে ইতিহাস ও জীবন চরিতের বড় আদর। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ের প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু ইতিহাস ও জীবনচরিত লিখিবার জন্য

যত্ন ছিল না। এজন্য এ দেশের প্রাচীন কালের অনেক বড় বড় লোকেরও জীবন-বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি। কোন কোন বড় লোকের জীবনী উপকথায়ও পরিণত হইয়া গিয়াছে। অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় ভাল ভাল ইতিহাস ও জীবনচরিত লিখার আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে যে রমণীর নামোল্লেখ করা যাইতেছে, তাঁহার জীবন প্রাতঃ স্মরণীয়। তাঁহার মত বড় লোক আর কেহ এ দেশের নারীসমাজে অল্পকাল মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

১১৩১ বঙ্গাব্দে রাজসাহির অন্তর্গত ছাতিম নামক গ্রামে, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী জন্ম গ্রহণ করেন। অন্য কোন কারণে, ছাতিম গ্রাম লোকের নিকট পরিচিত নহে, কিন্তু রাণী ভবানীর জন্মস্থান বলিয়াই উহা, পরম গৌরবে ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে পারে।

রাণী ভবানীর পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। আত্মারাম সঙ্গতিশালী লোক ছিলেন না। সামান্য অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়াও,রূপ গুণ ও চরিত্রবলে ভবানী রাজরাণী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী উপাধি, বা সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করাই তাঁহার জীবনের গৌরবের বিষয় নহে। পুণ্যশীলা ভবানীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, বীরত্ব ও পরদুঃখ-কাতরতাই তাঁহাকে ভারতের পূজনীয়া, ও নারীজাতির শিরোভূষণ করিয়া রাখিয়াছে।

ভবানী পরম রূপবতী ছিলেন ! আন্তরিক সৌন্দর্য্যের অভাবে, শারীরিক সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র মূল্যই থাকে না ; বরং তাহাতে অপকারই হইয়া থাকে। ভবানীর শরীর মন উভয়ই পরম সুন্দর ছিল। বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শতগুণ অধিক সৌন্দর্য্যে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইলে, বাল্যকালেই যেন তাঁহাকে প্রতিভা, দয়া ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। এই জন্য তিনি নাটোরাধিপতি রাজা রাম জীবনের পুত্রবধূ মনোনীত হইয়াছিলেন। রামজীবনের পুত্র রাজা রামকান্তের সঙ্গে ভবানীর বিবাহ হওয়াতেই, তিনি রাণী উপাধি পাইয়াছিলেন।

রামজীবনের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামকান্ত, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে রাজ্যলাভ করিলেন। বাল্যকালাবধি সুশিক্ষা না পাওয়াতে, রামকান্তের মতি গতি বড় ভাল ছিল না। পিতৃহীন হইয়া এবং রাজ্য লাভ করিয়া, তিনি বড় উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হইয়া উঠিলেন। অবিবেচক, স্বার্থপর ও চাটুকার বয়স্যদিগের কুপরামর্শে, রামকান্ত নানা কুকার্য্য করিয়া, পিতার সঞ্চিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। রাণী ভবানীর বয়স তখন পনের ষোল বৎসরের অধিক ছিল না। এই বয়সেও স্বামীকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। দয়ারাম

নামে রাজা রামজীবনের এক অতি বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী ছিলেন। বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে সামান্য ভৃত্যের অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া, দয়ারাম নাটোর-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন। রামজীবন দয়ারামকেই রামকান্তের অভিভাবক করিয়া যান। কুপ্রবৃত্তির সহচরদিগের পরামর্শক্রমে রামকান্ত দয়ারামকে তাড়াইয়া দিয়া, কুকার্য্যে অধিকতর নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

দয়ারাম বড় হিতৈষী কর্ম্মচারী ছিলেন। বুদ্ধিমতী ভবানী দয়ারামকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; তাই দয়ারামের পুনর্গ্রহণের জন্য অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকান্ত কিছুই শুনিলেন না। দুঃখে পড়িলে চরিত্র সংশোধিত হইবে বিশ্বাসে, দয়ারাম ভাবিলেন যে, কিছুকালের জন্য রাজ্যচ্যুত করিয়া রামকান্তকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। বাঙ্গালার তৎকালীন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট যাইয়া দয়ারাম বলিলেন যে, রাজা রামকান্ত বিপুল ধন কুকার্য্যে উড়াইয়া দিতেছেন, অথচ নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিতেছেন না। এই কথা শুনিয়া নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, দেবীপ্রসাদ রায় নামক এক ব্যক্তিকে রাজ্য দান করিলেন।

রাজ্যচ্যুত হইয়া রামকান্ত পত্নীসহ, নবাবের ধনাধ্যক্ষ জগৎ শেঠের আশ্রয় লইলেন। তাঁহার কুকার্য্যের সহচর

ভাক্ত বন্ধুরা, যে যার স্থানে চলিয়া গেল। রামকান্তের মোহ কতক পরিমাণে ঘুচিল। দয়ারাম পূর্ব্বাপরই নাটোর রাজবংশের হিতৈষী। রাণী ভবানী তাহা অবগত ছিলেন। এ সময়ে তিনি স্বামীকে অনেক উপদেশ দিয়া বশ করিয়া দয়ারামের সঙ্গে সৌহার্দ্দ পুনঃস্থাপন করাইলেন। ভবানী প্রদত্ত অর্থ ও নিজ বুদ্ধিবলে দয়ারাম রামকান্তকে পুনরায় রাজ্যদান করাইলেন। রাজ্যহারা হইয়া যখন জগৎ শেঠের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন রামকান্ত অর্থহীন। রাণী ভবানী নিজের কতক-গুলি মূল্যবান অলঙ্কার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ গুলিই তখন তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল; উহা হারাইলে একেবারেই কপর্দ্দকহীন হইতে হয়। কিন্তু রাণী ভবানী উহা অকাতরে দয়ারামের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভবানীর হৃদয় মহত্বে পূর্ণ ছিল। তিনি স্বামির হিতার্থে, এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারির হস্তে তখনকার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে কুন্ঠিত হইবেন কেন? ঐ সকল অলঙ্কার দ্বারা পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারাই দয়ারাম রামকান্তকে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পূর্ব্বকৃত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন জন্য, অচিরেই রাম-কান্তের শরীর ভগ্ন হইল। পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ বৎসর

বয়সে তিনি পরলোকে গমন করিলেন, আর রাজ্যভার রাণী ভবানীর উপরে পড়িল। ভবানীর বয়স তখন বত্রিশ বৎসর। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামকান্ত পরলোকগমন করেন। ঐ সময়ে দুর্ব্বৃত্ত শিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব ছিল। পর বৎসরই পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, ইংরেজেরা কার্য্যতঃ দেশের রাজা হইলেন। রাণী ভবানী যখন রাজ্যলাভ করেন, তখন শিরাজউদ্দৌলার অবিমৃষ্য-কারিতা ও অত্যাচার, এবং ইংরেজদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে দেশের ভয়ানক অবস্থা ছিল। সেই অবস্থায, বত্রিশ বৎসর বয়সে, রাণী ভবানী যেরূপ বুদ্ধিকৌশল ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, ভাবিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

তারা ঠাকুরাণী নামে রাণী ভবানীর এক পরম রূপ-বতী বিধবা কন্যা ছিল। পাপিষ্ঠ শিরাজ তাহাকে হস্ত-গত করিতে চাহে। রাণী ভবানী ঘৃণা ও ভর্ৎসনা করিয়া উত্তর দেওয়াতে, শিরাজউদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হইয়া একদল সৈন্য পাঠাইল। রাণী ভবানী কুলগৌরব রক্ষার জন্য অসীম বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক নবাব-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অপরদিকে কতকগুলি সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া কন্যাকে কাশীতে পাঠাইলেন। সৈন্যদিগকে দৃঢ়রূপে এই আজ্ঞা করিয়া দিলেন যে, যদি পথিমধ্যে

নবাবের সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহারা যুদ্ধ করিবে; যুদ্ধে জয়ী হইবার আশা না থাকিলে, অগ্রে তারার প্রাণনাশ করিয়া, তৎপরে তাহারা আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইবে।

রাণী ভবানীর বুদ্ধি বিক্রম ও দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়া, প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিত। নবাব, দেবী ভবানীর উপরে অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে, রাজ্যের সমস্ত প্রজা ক্ষেপিয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ লোককে যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া, নবাব-সৈন্য আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না। পাপিষ্ঠ শিরাজের দুরাশাও মিটিল না। পরপদানত ভীরু বাঙ্গালি-সমাজে রাণী ভবানী প্রকৃত প্রস্তাবেই দেবী ছিলেন। কুলগৌরব অথবা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, তিনি প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও ভীত হইতেন না, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সন্তানের রক্ত দান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

দানেতে রাণী ভবানী অন্নপূর্ণা সদৃশ ছিলেন। দরিদ্র-দিগকে বস্ত্রদানের, এবং অসমর্থ রুগ্নদিগের চিকিৎসার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল; তাহারা অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ ও পথ্য লইয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিত। ভবানী স্বয়ং কত দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; কর্ম্মচারিদিগের উপরেও এক কালীন একশত টাকা পর্য্যন্ত দান করিবার

অধিকার দিয়া রাখিয়াছিলেন। জলাশয় খনন, দেবালয় স্থাপন, এবং মুসলমান রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব ভদ্রলোকদিগকে, বাড়ীঘর ও ভূম্যাদি দান যে তিনি কত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আজিও নানা শ্রেণীর লোকে, রাণী ভবানীর প্রদত্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ বিঘা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছে। ভবানীর উদারতার সীমা ছিল না। তিনি হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাসী, কিন্তু সাধু চরিত্র মুসলমানদিগকেও নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন।

রাণী ভবানী স্বয়ং অধিক বিদ্যাবতী ছিলেন না, কিন্তু বিদ্যার পরম সমাদর করিতেন। প্রতি বৎসর চতুষ্পাঠির পণ্ডিতদিগকেও তিনি প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দান করিতেন। বিপুল ধনের অধীশ্বরী হইয়াও রাণী ভবানী সামান্য বেশে থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও নিস্পৃহতার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একবার রাজা রামকান্ত বহুমূল্য দুই ছড়া হীরকের হার আনিয়া রাণী ভবানীর হাতে দিয়াছিলেন। কতককাল পরে সেই হারের কথা উঠিলে, রামকান্ত বলিলেন যে, বড় হার ছড়া রাণী ভবানীর জন্য, আর ছোট গাছি ভবানী-পুরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের জন্য আনিয়াছেন। রাণী ভবানী বলিলেন যে, হার পাওয়া মাত্রই তিনি বড়গাছি বিগ্রহকে দিবেন মনে করিয়াছেন। রামকান্ত এ কথায় কিঞ্চিৎ

আবেগের সঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তবে কি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না?" ভবানী হাস্যমুখে বলিলেন, "তবে উভয়েরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। এই বলিয়া তিনি দুইগাছিই বিগ্রহকে দিলেন।

রাণী ভবানী অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা হইয়া থাকিতেন না। সন্ধ্যাকালে মন্ত্রভবনে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া, অমাত্যবর্গসহ রাজকার্য্যের মন্ত্রণা করিতেন। প্রজাদিগের আবেদন সকল সেই স্থলে পঠিত হইত, আর তিনি তচ্ছ্রবনে উচিত আদেশ প্রদান করিতেন। ভবানী সময়কে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগে ধর্ম্মানুষ্ঠান, অপর ভাগে পরোপকার, এবং অবশিষ্ট অপর ভাগে রাজকার্য্য করিতেন। বৃদ্ধকালে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া, বড়নগর নামক স্থানে গঙ্গাতীরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেখানে কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পরোপকারই করিতেন। ১২১০ সালে ঊনাশী বৎসর বয়সে, বড়নগরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইদানীন্তনকালে রাণী ভবাণীর মত প্রতিভাশালিনী ও পুণ্যবতী মহিলা অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

পশু-সভা।

একদা গড়ের মাঠে সন্ধ্যার সময়,
কলিকাতা নগরের পশু সমুদয়,
করিলা প্রকাণ্ড সভা অতি চমৎকার ;
রয়েছে সংবাদপত্রে বিবরণ তার।
মধ্যেতে মহিষ বসে ঘোটক বামেতে,
দক্ষিণেতে বলীবর্দ্দ গর্দ্দভ পশ্চাতে ;
সম্মুখে মার্জ্জার আর সারমেয় দোঁহে,
এক পার্শ্বে মেষ আসি যোড়হস্তে রহে।
প্রথমে সকলে মৌনী, (সভ্যের লক্ষণ)
লাঙ্গুল নাড়িয়া শুধু করিছে ব্যজন।
বক্তৃতা করিতে যাই ঘোটক উঠিলা,
আনন্দে সকলে মিলি করতালি দিলা।
গ্রীবা বক্র করি অশ্ব লাগিলা কহিতে,—
"মানুষের অত্যাচার পারি না সহিতে ;
মানুষের কপালে হউক বজ্রপাত,
পৃষ্ঠে চ'ড়ে কেশে ধ'রে করে কশাঘাত।

চর্ম্মডোরে মুখ চোক সজোরে বাঁধিয়া,
বড় বড় শকটেতে দিতেছে যুড়িয়া।
সারাদিন সম শ্রম করি বার মাস,
উদর পূরিয়া খেতে নাহি পাই ঘাস ;
একে শুষ্ক পরিমাণে তাহে কম কত,
বঙ্গবাসী চাকুরের বেতনের মত !
দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাই কয়েদী যেমন,
মানুষের মত পাপী কে আছে এমন ?
দুটি মাত্র শৃঙ্গ যদি থাকিত আমার,
করিতাম মানুষের জীবন সংহার।
শৃঙ্গ নাড়া দিলে কেহ না আসিত কাছে,
শিখাতেম মানুষেরে সংশয় কি আছে ?"
এত বলি বসিলেন ঘোটক যখন,
"ধন্য ধন্য" শব্দে পূর্ণ হইল গগন।
মৃদুস্বরে মেষ যবে কহিতে লাগিলা,
"শোন শোন" উচ্চ শব্দ রাসভ করিলা।
মেষ কহে—"দেশে আর না আছে বিচার,
এক মুখে আমি তাহা কহিব কি আর ?
ঘোটক যে কহিলেন সত্য সমুদয়,
আমাদের দুঃখ কিন্তু তুলনীয় নয় !
অযতনে থাকি মোরা মাঠে ঘাস খাই,

মানুষের শীতবস্ত্র অনেক যোগাই ;
মরিয়াও চর্ম্ম দিয়া উপকার করি,
তবু তারা মোদের গলায় দেয় ছুরি !
আপনার পুত্রোৎসবে পরপুত্রে মারে,
মানুষের মত পাপী কে আছে সংসারে ?
দন্ত নাই নখ নাই দেহে নাই বল,
সম্বল কেবল বটে নয়নের জল !"
এত কহি মেষ যবে বসিলা ভূতলে,
"ধিক্ ধিক্ !" মহাশব্দ করিলা সকলে।

সভাপতি বলীবর্দ্দ উঠিয়া তখন,
কহিতে লাগিলা ধীর গম্ভীর বচন ;—
"অদ্যকার এ সভার বক্তৃতা সুন্দর,
করিলাম সকলেই শ্রবণগোচর ,
মানুষের অত্যাচার সকলেই জানি,
একটী উপায় ভাল আমি অনুমানি ;
মানুষের আজ্ঞাবহ থাকিব না আর,
অত্যাচারে সকলে করিব প্রতীকার।"
"ভাল ভাল !" বলিলেক সভাস্থ যতেক,
সভাপতি ধন্যবাদ পাইলা অনেক।

এই রূপে হবে যবে সভা ভঙ্গপ্রায়,
আরণ্যমার্জ্জার এক আইল তথায়,

সকলেরে সম্বোধিয়া কহিল তখন—
"তোমাদের কথা সব করেছি শ্রবণ ;
ঘোটকের শৃঙ্গ নাই আছে দৃঢ় ক্ষুর,
শরীরেও সামর্থ যে রয়েছে প্রচুর ;
তবে কেন মানুষের কেনা হয়ে রহে,
আপনার শত্রু জনে পৃষ্ঠে কেন বহে ?
যার আছে বল বুদ্ধি সমৃদ্ধি সাহস,
পৃথিবীতে অনেকেই হয় তার বশ ;
বুদ্ধিহীন ভীরু বটে হতভাগ্য অতি ;
নিজ দোষে তোমাদের এমন দুর্গতি।
মেষ বটে ক্ষুদ্র কিন্তু তার শৃঙ্গ আছে,
তবে কেন কাষ্ঠবৎ মানুষের কাছে ?
আরো দেখ তোমাদের থাকিলে একতা,
দুর্ব্বল সবল হতো, না হতো অন্যথা ;
তোমরা অধম জাতি অতি নীচাশয়,
পরস্পর হিংসা করি বল কর ক্ষয় ;
গর্দ্দভে ঘোটকে বাদ জানি অতিশয়,
মহিষে বলদে মিল কভু নাহি হয় ;
অসহায় মেষগুলি মাঠ মধ্যে চরে,
নিষ্ঠুর কুক্কুর তারে দংশে অকাতরে।
নিজ হিত চাহ যদি মোর কথা লও,

পরস্পর ভালবেসে দলবদ্ধ হও ;
অত্যাচার করিবেক মানুষ যখন,
সকলে মিলিয়া তারে করো আক্রমণ ;
ইহাতেও যদি শেষে আঁটিতে না পার,
রাজধানী-বাস-আশা পরিহার কর ;
অধীনতা পরিহরি অরণ্যেতে যাও,
কাননের ফল মূল মনসুখে খাও ;
আপনার স্বাধীনতা করে যেই দান,
ধরাতলে কোথা বল থাকে তার মান ?
পরমুখ চায় যেবা জীবিকার তরে,
তার মত হতভাগ্য কে আছে সংসারে ;
ধরাতলে যেই জন হয় পরাধীন,
কাননের পশু হতে (ও) জেনো তারে হীন।

রাজা রামমোহন রায়।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে, মহাত্মা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রাম-মোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায়, মাতার নাম তারিণী দেবী। তারিণী দেবী "ফুল ঠাকুরাণী" নামে

পরিচিতা। ফুল ঠাকুরাণী বড় তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও শুদ্ধচারিণী ছিলেন ; এজন্য তাঁহার পতি প্রায় সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার পরামর্শ লইতেন।

মাতার গুণে প্রায়ই সন্তান ভাল হইয়া থাকে। রামমোহন যে উত্তরকালে এত বড় লোক হইয়া, পৃথিবীতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জননীর বুদ্ধি ও চরিত্রবল তাহার এক প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। অতি শিশুকালাবধিই রামমোহন শিক্ষায় এত অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, পাঁচ বৎসর বয়সের সময়েই মাতাকে ছাড়িয়া গিয়া শিক্ষার জন্য স্থানান্তরে ছিলেন।

কয়েক বৎসর পরে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ফুল ঠাকুরাণী রামমোহনকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন! তথায় রামমোহন ধর্ম্ম-নীতি ও আইন শিক্ষা করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়, বর্দ্ধমানের রাজার অধীনে কতকগুলি ভূমি ইজারা রাখিতেন। পিতার বিষয়কার্য্য শিক্ষার জন্য, উত্তর পশ্চিমে যাইবার পূর্ব্বেই রামমোহন পারসী ও আরবী শিখিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি এরূপ কৃতবিদ্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন যে, আসিয়াই দেশের তৎকাল-প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রচলিত সংস্কার বা ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে, চিরকালই অনেক লোক বিরোধী হইয়া থাকে। যাহারা প্রচলিত সংস্কারাদিতে বিশ্বাসী, তাঁহারা বিরোধী হইলে অনুযোগ করা যায় না বটে, কিন্তু যাহারা স্বার্থসাধনের জন্য বিরোধী হইয়া, সত্য ও ন্যায়কে অনাদর করে, তাহারা যারপর নাই নিন্দনীয়! দুঃখের বিষয় এই যে, প্রত্যেক সমাজেই এইরূপ লোকের সংখ্যা কম নহে এবং সর্ব্বত্রই তাহারা সত্যনিষ্ঠ ও সাধু লোকদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকে!

প্রচলিত মত ও আচার-ব্যবহারে ফুল ঠাকুরাণীর দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছিল। রামমোহন কুসংস্কার-বিহীন ও স্বাধীন চেতা হইয়া উঠিলেন বলিয়া, মাতার সঙ্গে ক্রমেই আচার ব্যবহারে বিসদৃশ হইয়া পড়িলেন। মাতা পুত্রে এইরূপ পার্থক্য দেখিয়া, স্বার্থপর সামাজিকেরা ফুল ঠাকুরাণীকে,পুত্রের বিরুদ্ধে অধিকতর উৎসাহিত করিতে লাগিল। আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিকদিগের প্ররোচনার বশে, রামমোহনের জননী অগত্যা রাম-মোহনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়সে রামমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। অন্য সহায় সম্বল না থাকিলেও, তিনি সহায়-সম্বল-বিহীন ছিলেন না। বুদ্ধি ও বিদ্যা তাঁহার সহায়,

এবং সাহস ও সত্যনিষ্ঠাই তাঁহার সম্বল ছিল। এই সহায় ও সম্বল লইয়া, তিনি সেই বালক বয়সেই যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে তেমন আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামমোহনের জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল ছিল যে, সেই বালক বয়সেই তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করিবার জন্য তিব্বৎ দেশে গিয়া উপস্থিত হন! তখন ভারত-বর্ষে রেল পথ প্রস্তুত হয় নাই; দেশের অবস্থা এরূপ ভয়ানক যে, দূরস্থানগামী পথিক মাত্রকেই দস্যুভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হইত। সেই সময়ে যে বালক ধর্ম্মানুশীলন করিবার জন্য, পদব্রজে হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া, তিব্বৎ দেশে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে, পৃথী-বীতে তাহার মত বীর পুরুষ আর কে আছে?

কিন্তু রামমোহনের কেবল প্রবল জ্ঞান-পিপাসাই ছিল না; মানুষের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্যও তিনি নিয়ত যত্নবান ছিলেন। তিব্বতে যাইয়া প্রখর মেধা-শক্তির বলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তথাকার প্রচলিত ধর্ম্মমতও কুসংস্কারপূর্ণ; তাই সেই বয়সেই লামা নামক বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বত্রই স্বার্থপর, নীচ ও নিষ্ঠুর লোক বিদ্য-মান রহিয়াছে। তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া লামাগণ তাঁহার

প্রাণনাশে অভিলাষী হইল! কোন কোন দয়াবতী বৌদ্ধ রমণীর আশ্রয়ে তিনি রক্ষা পাইলেন।

তিব্বৎ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, অসীম অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের পিতা, পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশালী এবং পুত্রের গুণগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। ফুলঠাকুরাণী অধিকাংশ বাঙ্গালী স্ত্রীর মত স্বামীর হস্তের পুতুলের মত ছিলেন না; তাঁহার বুদ্ধি, তেজস্বীতা ও ধর্ম্মসংস্কারের বিরুদ্ধে, রামকান্ত কিছু বলিতে বা করিতে পারিতেন না। রামকান্ত প্রায় সর্ব্বদাই এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন যে, রাম বিনে দশরথের যেমন প্রাণ গিয়াছিল, আমার রাম বিনেও সেইরূপ আমার প্রাণ যাইবে! বিশ বৎসরের সময় রামমোহন দেশে আসিলে, ফুলঠাকুরাণী পতির কাতরতা হেতু রামমোহনকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার পরিবার ও সমাজের সঙ্গে রামমোহনের স্বতন্ত্রতা ঘটিল। এই সময়ে তিনি রাজস্ব বিভাগে এক সামান্য কর্ম্ম লইয়া রঙ্গপুরে গেলেন, এবং বুদ্ধি ও চরিত্র গুণে অল্পকাল মধ্যেই রঙ্গপুরের কালেক্টরের দেওয়ানী পদ পাইলেন। কোন বাঙ্গালিই তৎকালে ইহা অপেক্ষা উচ্চপদ পাইতেন না। রাম-

মোহন ইহার পূর্ব্বে সামান্য ইংরেজী জানিতেন ; এইক্ষণ ঐ ভাষা ভাল করিয়া শিখিলেন। কয়েক বৎসর বিপুল অর্থ ও যশ লাভ করিয়া রামমোহন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আইসেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরেই তিনি কার্য্য ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র।

স্বীয় ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য ফুল ঠাকুরাণী রামমোহনকে বার বার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন ; কিন্তু রামমোহন এমনই মাতৃভক্ত ছিলেন যে, যাহাতে মাতার মনে ক্লেশ না দিয়া পারেন, তজ্জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। পিতার মৃত্যুর পরে আইন অনুসারে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু মাতার মনে ক্লেশ দিয়া তাহা করিলেন না। এমন কি রঙ্গপুর হইতে আসিয়া; সর্ব্বাগ্রে মাতার পদধূলি না লইয়া কোন কার্য্যই করিলেন না।

চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি বিশেষরূপে ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। ঐ জন্য তিনি মুর্শিদাবাদে এক বাটী নির্ম্মাণ করেন। ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলে, চারিদিক্ হইতে তাঁহার উপরে অত্যাচার আরম্ভ হইল। একবার চারি পাঁচ হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে নানারূপে নির্য্যাতন করিতে লাগিল!

মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দেওয়া ভিন্ন, কোনরূপে তিনি তাহা দিগের অনিষ্ট করেন নাই

রামমোহন রায়ের বিদ্যাবত্তার কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তিনি দশটী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্ন স্বরূপ। জনসমাজের হিতের জন্য, নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তিনি এই সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার হৃদয় দয়া ও দৃঢ়তায় এমন পূর্ণ ছিল যে, পরহিতার্থে যাহাতে লাগিতেন, চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। একজন প্রতিবেশী রমণীকে নিষ্ঠুরভাবে পতির সঙ্গে দগ্ধ করিতে দেখিয়া, তিনি অশ্রুপাত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথা যেরূপেই হউক উঠাইয়া দিবেন। অশেষ পরিশ্রম করিয়া, তিনি আইন করিয়া ঐ প্রথা উঠাইয়া দেন। মহাত্মা রামমোহন স্ত্রীজাতির পরম হিতৈষী ছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গভাষার তিনি প্রচুর উপকার করিয়াছেন। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে তিনিই বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য লেখক। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে তিনি এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

এত বড় লোক হইয়াও রামমোহন নিরভিমান ছিলেন। তাঁহার উদারতারও সীমা ছিল না। ছোট বড় সকলকেই তিনি সমান যত্ন করিতেন। একবার বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও অপর একজন ভদ্রলোক, এক সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তিনি উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ প্রকৃত মহত্ত্বে পূর্ণ ছিল; তাই তিনি কখনও কোন বড় লোকের তোষামোদ করিতেন না। একবার ভারতবর্ষের তাৎকালিক রাজ প্রতিনিধি লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে ডাকাইয়াছিলেন। তিনি নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ফেলিয়া তথায় গেলেন না দেখিয়া, মহাত্মা বেণ্টিঙ্কই তাঁহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে তিনি প্রায় শোক ও মোহের অতীত স্থানে অবস্থিতি করিতেন। দূর হইতে পত্নীর মৃত্যুসংবাদ আসিলে তিনি, তাঁহার নিজের রচিত—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"—পদ-প্রমুখ গান গাইতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের বৈরাগ্য বিষয়ক গীত শ্রবণ করিলে পাষণ্ডের প্রাণও বিগলিত হয়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লির বাদসাহের দৌত্যকার্য্য লইয়া

রামমোহন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে বাদসাহই তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইংলণ্ডে যাইয়া তিনি অল্পকালই ছিলেন। কিন্তু ঐ অল্পকাল মধ্যেই ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যেরূপ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই বিলাতের বিজ্ঞ ও সাধু লোকেরা তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। ব্রিষ্টলনগরে তাহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাত্মা রামমোহনের মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন মনুষ্য ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

সাহস ও সামর্থ্য

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে,— শুনিয়াছি উপন্যাসে
কথা বটে অতি মনোহর,
নানাবিধ গুণধাম, সাহস, সামর্থ্য নাম,
আছিল দুইটী সহোদর।
একজন ক্ষীণকায়, কিন্তু অগ্নিশিখা প্রায়;
কাহাকেও নাহি করে ভয়;

আর জন মহাবল, মত্তমাতঙ্গের দল,
তার বলে পরাজিত হয়।
পরস্পর এত স্নেহ, যেন দোঁহে একদেহ,
এমন আশ্চর্য্য দেখি নাই ;
"মায়ের পেটের ভাই, হেন বন্ধু কোথা পাই ?"
এই তারা কহিত সদাই।

২

একদিন দুই ভাই, বসেছিল একঠাঁই,
যুক্তি করে নিবিষ্ট হইয়া ,
"চলহ বিদেশে গিয়া, ধন রত্ন উপার্জ্জিয়া,
গৃহে ফিরি সুযশ লইয়া।
না হইলে বৃদ্ধকালে, সন্তান সন্ততি হলে,
কারো কাছে না পাইব মান ;
চিরদিন গৃহে থাকে, উঠান সমুদ্র দেখে,
যেই জন সে বড় অজ্ঞান।
আমরা দুইটী ভাই, এক সঙ্গে যথা যাই,
কেহ নহে আমাদের সম ;
বহু উপার্জ্জন হবে, অনেক সুখ্যাতি রবে,
করিব অনেক পরিশ্রম !"

৩

এইরূপ যুক্তি করি, উপযুক্ত বেশ পরি,

যথাকালে প্রস্তুত হইয়া ;
ঈশ্বরের নাম স্মরি, মা বাপে প্রণাম করি,
বিনয়েতে বিদায় লইয়া।
দুই ভাই একসঙ্গে, চলি যায় মনোরঙ্গে,
বহুদূর করিলা গমন,
কত নগরের ঠাট, হাঠ মাঠ ঘাট বাট,
নিরখিয়া পুলকিত মন।
এক সুখে দোঁহে সুখী, এক দুঃখে দোঁহে দুঃখী,
দোঁহাকার যেন এক প্রাণ ;
যে দেখে সে দুই জনে, দেব কি গন্ধর্ব্ব জ্ঞানে,
শত মুখে গায় গুণ গান।

৪

কিন্তু হায় চির দিন, সমভাবে কারো দিন,
এই ভবে না যায় কখন,
পথে দুই সহোদরে, সহসা বিবাদ করে,
হলো যেন অঘট্য-ঘটন !
"তুমি ছোট আমি বড়," এই মনে করি দড়,
দুই জনে বিবাদ বাধিল,
মনেতে পাইয়া ব্যথা, পরস্পর রুষ্ট কথা,
অনুচিত কহিতে লাগিল।
সামর্থ্য সাহসে বলে, "তৃণসম তুমি ফলে,

জানি তব বাক্য মাত্র সার,"
সাহস সামর্থ্যে কয়, "তুই অতি নীচাশয়,
ভীরু হয়ে এত অহঙ্কার!"

৫

এরূপে বিবাদ করি, একে অন্যে পরিহরি,
দুই দিকে করিল গমন,
সাহস উত্তরে যায়, সামর্থ্য দক্ষিণে ধায়,
পশ্চাতে না করে দরশন।

দিন গেল সন্ধ্যা হলো, মহাভয় উপজিল,
হীন-প্রাণ সামর্থ্যের চিতে,
"কোথায় রহিলে ভাই, আর কার মুখ চাই!"
এত বলি লাগিলা কাঁদিতে।

নিকটেতে শালবন, তাহা হতে একজন,
দস্যু যাই দিল দরশন,
ভাবি মনে "কি অদ্ভুত, দানা দৈত্য কিবা ভূত!"
সামর্থ্য হইল অচেতন।

বেশভূষা যত ছিল, তস্করে তা হরে নিল,
লতাপাশে বাঁধিয়া সজোরে,
মহাকায় সামর্থ্যেরে, দস্যু বহু শ্রম করে,
ফেলে গেল গর্ত্তের মাঝারে।

৬

এদিকে সাহস শূর, চলি গেলা বহু দূর,
দুর্গ এক করি দরশন,
যত সৈন্য সেনাপতি, সজোরে তাদের প্রতি,
ডাকি কহে 'শীঘ্র দেহ রণ।"
সাহসের দেখি রূপ, সকলেই অপরূপ
ভাবি, মনে হাসে বারবার,
তৃণের সমান দেহ, এমন আস্পর্দ্ধা সেহ
করিতেছে, একি চমৎকার!
বালক সৈনিক ছিল, হাসিতে হাসিতে এল,
সাহসের সঙ্গে যুঝিবারে,
যষ্টির প্রহার করি, সাহসে অজ্ঞান করি,
উড়াযে ফেলিল বহু দূরে,

৭

যাতনায় মৃত প্রায়, সাহস কাঁদিয়া কয়,
হায় মোর কপাল-লিখন.
কোথারে গুণের ভাই, তোমারে ছাড়িনু তাই,
অকালেতে হারাই জীবন।
ভাই ভাই করে দ্বন্দ্ব ইহার সমান মন্দ,
এ সংসারে আর কিছু নাই;
ভ্রাতৃ-প্রেম আছে যার কিসের অভাব তার?

তার গুণ বলিহারি যাই।
আমরা দুইটী ভাই, থাকি যদি এক ঠাঁই,
সোনায় সোহাগা সম হয়;
মহাশত্রু ভয় পায়, শত রাজ্য ঠেলি পায়,
জগত করিতে পারি জয়।"

৮

গত হলে বহুক্ষণ, অনুতাপে দগ্ধ মন,
হলো যবে জ্ঞানের উদয়,
করিয়া পরাণ পণ, পরস্পর অন্বেষণ,
আরম্ভ করিলা ভ্রাতৃদ্বয়।
পুনর্ব্বার দেখা হলে, ভাসিয়া নয়ন জলে,
স্নেহ ভরে করিলা মিলন,
গত দুঃখ মনে করি, পরস্পর ক্ষমা করি,
উভয়ে করিলা আলিঙ্গন।
দুই ভাই পুনরায়, একত্র বিদেশে যায়,
কার্য্য করে করিয়া যতন,
বহু ধন রত্ন লয়ে, বহু যশে পূর্ণ হয়ে,
স্বদেশে করিলা আগমন। *

---

* ভ্রাতৃ ভাবের মহত্ব, এবং সাহস ও সামর্থ্য মিলনের উপকারিতা ও বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে উহার বিশেষ আবশ্যকতা, শিক্ষক মহাশয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবেন।

সম্পূর্ণ।